৫.ইসলাম প্রচারে তরবারীর ভূমিকা (পর্ব-১ ‘তলোয়ারে নয় উদারতায়’ শীর্ষক শ্লোগানের উৎপত্তি; সংক্ষিপ্ত ইতিহাস)

ইসলাম প্রচারে তরবারীর ভূমিকা

‘তলোয়ারে নয় উদারতায়’ শীর্ষক শ্লোগানের উৎপত্তি

১৪৯৩ সনে আন্দালুসে সর্বশেষ মুসলিম ভূখন্ড গ্রানাডার পতনের পর খৃষ্টান পাদ্রী আন্দালুসকে পর্তুগাল ও স্পেনের মাঝে ভাগ করে দেয়। এর অব্যব্যহিত পরেই পর্তুগালের রাজার নির্দেশে জলদস্যু ভাস্কো-দা-গামা মুসলিম ভূমির সমুদ্র পথ আবিষ্কারের জন্য বেরিয়ে পড়ে। সে যখন উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করে ভারত সাগরে পৌঁছে তখন সে বলে উঠে “এই তো আমরা মুসলিম ভূমিসমূহের গলায় রশি পেঁচিয়ে ফেলেছি, এখন শুধু আমরা রশিতে টান দিবো তাহলেই তা শাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাবে।” পর্তুগালের পর বৃটেন, ফ্রান্স, হল্যান্ড, ইটালী ও ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্র মুসলিম *ভূমিসমূহ জবরদখলের জন্য নিজেদের মাঝে প্রতিযোগীতা শুরু করে। এমনকি উনবিংশ শতাব্দীতে এসে তারা প্রায় পুরো মুসলিম বিশ্ব দখল করে নেয়। (আলমুস্তাশরিকুনা ওয়াল ইসলাম, মুহাম্মদ কুতুব, পৃ: ৪৫ মাকতাবাতু ওয়াহবাহ, কাহেরা, প্রথম প্রকাশনা ১৪২০ হি.)

কিন্তু মুসলমানদের জিহাদি জজবার কারণে তারা দুদণ্ড সুস্থির হয়ে দেশশাসন করতে ব্যর্থ হয়। স্থানীয় মুসলমানদের একের পর এক বিদ্রোহ তাদেরকে পেরেশান করে তোলে। মুসলমানদের জিহাদী কর্মকাণ্ড তাদেরকে কতটা বেকায়দায় ফেলেছিল সেটা নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠে। ১৮৮২ সালে মিসর দখলের পর বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম গ্ল্যাডস্টোন বৃটিশ পার্লামেন্টে কোন রাখঢাক না রেখেই বলে, "যতদিন মুসলমানদের হাতে কোরআন থাকবে ততদিন আমরা তাদের দেশে স্থায়ী হতে পারবো না।"

লরেন্স ব্রাউন বলে, "আমাদেরে জন্য সবচেয়ে বড়ো আশংকা সুপ্ত রয়েছে ইসলামের প্রাণবন্ত জীবন ব্যবস্থায়, যা নিজ ভূখন্ডের সীমানা বিস্তৃত করতে ও (অন্য জাতিবর্গকে) নিজের অধীনস্থ বানাতে সক্ষম। ইসলামই হলো ইউরোপিয়ান উপনিবেশবাদের পথে একমাত্র বাঁধার প্রাচীর।"

(আলমুবাশশিরুনা ওয়াল মুস্তাশরিকুনা ফি মাওকিফিহিম মিনাল ইসলাম, মুহাম্মদ আলবাহীই, মাতবাআতুল আযহার, পৃ: ৬ আততাবশীর ওয়াল ইস্তে'মার, মুস্তফা খালিদী, পৃ: ১৮৪ আলমাকতাবাতুল আছারিয়্যাহ, বৈরুত, পঞ্চম প্রকাশনা, ১৯৭৩ ই. আলমুস্তাশরিকুনা ওয়াল ইসলাম, মুহাম্মদ কুতুব, পৃ: ১১)

মুসলমানদের জিহাদী আকিদা-বিশ্বাস শুরু থেকেই তাদের ভয়ের কারণ ছিল, সময় সময় তারা এই ভীতি প্রকাশও করেছে, ইংরেজী পত্রিকা 'ইসলামী বিশ্ব' (The Muslim World) এর ১৯৩০ সালের জুন মাসের সংখ্যায় বলা হয়, "পশ্চিমা বিশ্বের (ইসলামের ব্যাপারে) কিছুটা ভীতসন্ত্রস্ত থাকাই উচিত। এ ভয়ের অনেক কারণ রয়েছে, তার মধ্যে একটি হলো, মক্কায় ইসলামের সূচনা থেকে শুরু করে ইসলাম কখনো সংখ্যায় কমেনি। বরং মুসলমানদের সংখ্যা সর্বদা বাড়ছে (এবং তাদের ভূমি) বিস্তৃত হচ্ছে। অধিকন্তু ইসলাম শুধু (কিছু আচারপ্রথা সর্বস্ব) দীন নয়, বরং এর অন্যতম বিধান হলো জিহাদ।" রবার্ট বেন বলে, "ইতোপূর্বে মুসলমানরা পুরো পৃথিবীর সাথে যুদ্ধ করেছে। হয়তো তারা পুনরায় তাই করবে।" কানাডিয়ান প্রাচ্যবিদ উইলফ্রেড স্মিথ বলে, "ইউরোপ কখনো কয়েক শতাব্দী ধরে বিরাজমান সেই ভয়ভীতির কথা ভুলতে পারে না, যখন মুসলমানরা পূর্ব-পশ্চিম ও দক্ষিণে রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস করার পর পুরো ইউরোপ দখলের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। (আলমুবাশশিরুনা ওয়াল মুস্তাশরিকুনা ফি মাওকিফিহিম মিনাল ইসলাম, পৃ: ৬ আলমুস্তাশরিকুনা ওয়াল ইসলাম, পৃ: ৭৬-৭৭ আলমুস্তাশরিকুনা ওয়াস সিরাতুন নাবাউয়্যাহ, ইমাদুদ্দিন খলিল, পৃ: ২২ দারু ইবনি কাসীর, দিমাশক, প্রথম প্রকাশনা ১৪২৬ হি.)

তেমনিভাবে দীর্ঘ কয়েক শত বছর ধরে চলমান ক্রুসেড যুদ্ধের অভিজ্ঞতার আলোকেও তারা উপলব্ধি করে নেয় যে, মুসলমানদের জিহাদি জজবা মিটিয়ে ফেলা ব্যতীত তাদেরকে পরাজিত করা সম্ভব নয়। অষ্টম ক্রুসেড যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ক্রুসেডরদের সম্মিলিত বাহিনীর প্রধান ফ্রান্সের বাদশাহ লুইস মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। সে বন্দীদশা থেকে মুক্তির জন্য অনেক বড় অংকের মুক্তিপন ব্যায় করে। ফ্রান্সে ফিরে গিয়ে সে খৃষ্টানদের উপদেশ দিয়ে বলে, "শক্তির জোরে মুসলিমদের পরাজিত করা সম্ভব নয়। কেননা মুসলিমদের আকিদা-বিশ্বাস তাদেরকে মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষা এবং তাদের ইজ্জত-সম্মান বাঁচানোর জন্য জিহাদ ও শাহাদাতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। মুসলিমরা তাদের ধর্ম বিশ্বাসের কারণে সর্বদাই জিহাদ করে শত্রুকে পরাস্ত করতে সক্ষম। তাই মুসলিমদের পরাজিত করার একটাই পদ্ধতি। তাদের ইসলামী চিন্তাদর্শকে পরিবর্তন করে ফেলা এবং স্নায়ু যুদ্ধ ও মনস্তাত্ত্বিক লড়াইয়ের মাধ্যমে তাদেরকে দমিত করা। যার পদ্ধতি হবে ইউরোপীয়ান পন্ডিতরা ইসলামী সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করবে এবং এর মাধ্যমে মুসলমানদের আকিদা-বিশ্বাস দুর্বল করে দিবে, যে আকিদার বলে বলীয়ান হয়ে তারা জিহাদ ও শাহাদাতের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়।"
(আসালিবুল গাযউইল ফিকরি, শায়েখ আলী মুহাম্মদ

জুরাইশাহ, পৃ: ১৯ দারুল ওফা, তৃতীয় প্রকাশনা, ১৩৯৯ হি.)

এ সব বিষয়কে সামনে রেখে তারা সিদ্ধান্ত নেয়, যে কোনো মূল্যে মুসলমানদের জিহাদি জজবা নিঃশেষ করে দিতে হবে। এবার এ কাজটাকে তারা নিজেদের লক্ষ্যে পরিণত করে। লক্ষ্য পূরণে তারা একাধিক কর্মসূচী হাতে নেয়। যেমন বিভিন্ন নামধারী আলেম জনসম্মুখে নিয়ে আসা যারা জিহাদের অর্থ বিকৃত করবে, দখলদারদের বিরুদ্ধে জিহাদ হারাম, তাদের আনুগত্য করা ফরয ইত্যাদী ফতোয়া দিবে। মুসলিম সন্তানদের পাশ্চাত্যের আদলে শিক্ষা দিয়ে তাদেরকে পাশ্চাত্যের ধ্যানধারণায় গড়ে তোলা, যেন তারা নামে মুসলিম হলেও মনমগজে হয় ইউরোপীয়ান। ফলে বস্তুবাদে বিশ্বাসী ভোগবিলাসে আকন্ঠ নিমজ্জিত এ নামধারী মুসলিমরা পাশ্চাত্যের বিপক্ষে জিহাদ করা, তাদের সাথে শত্রুতার পরিবর্তে ওদেরকে খাটি মুসলিমদের চেয়েও আপন মনে করবে। মোটকথা জিহাদি জজবা স্তিমিত করার সম্ভাব্য সবরকম প্রচেষ্টা তারা ব্যয় করতে শুরু করে দেয়।

আমাদের আলোচ্য ব্যাপারটিও তাদের সেই কর্মসূচীর অতি উৎকৃষ্ট একটি নমুনা। এর উৎপত্তিটা লক্ষ করুন। প্রথমে কাফেরদের একপক্ষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রপাগান্ডা শুরু করে, "ইসলাম তরবারীর জোরে প্রচার হয়েছে।" তারা বারবার

বিভিন্ন উপলক্ষে প্রচার করতে থাকে যে, "মুসলমানরা জোরপূর্বক মানুষকে মুসলমান বানানোর জন্যই যুদ্ধই করতো। এজন্যই তাদের ইতিহাস শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে ভরপুর"। নাদান মুসলমানেরা তাদের এই অপবাদে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। তারা ইসলামকে বাঁচানোর জন্য বলতে থাকে, "না, না, ইসলাম তো শান্তির ধর্ম, ইসলাম উত্তম আচরণের মাধ্যমেই পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করেছে। ইসলামের মতো শান্তির ধর্ম তরবারী দ্বারা প্রচারিত হতেই পারে না। ইসলাম তো শুধু আত্মরক্ষার জন্য তরবারী উত্তোলন করতে বলে। ইসলাম প্রচারে তরবারীর কোন ভূমিকা নেই, ইত্যাদি।"

একই সময়ে কাফেরদের অন্য একটা দল মুসলমানদের বন্ধু সেজে মঞ্চে আগমন করে। তারা ইসলামের প্রতি মেকী দরদ নিয়ে ইসলাম রক্ষায় প্রচেষ্টারত মুসলিমদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। প্রাচ্যবিদ টমাস আর্নল্ড 'ইসলামের দিকে আহ্বান' (The Preaching of Islam) নামে একটা বই লেখে। যাতে সে বিভিন্ন যয়ীফ-মওযু কেচ্ছাকাহিনী দ্বারা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, ইসলাম প্রচারে তরবারীর কোনো ভূমিকা নেই। ইসলাম তো প্রচার হয়েছে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতি এবং কুফরী শাসনব্যবস্থার সাথে ইসলামী শাসনব্যবস্থার ঐক্যের মাধ্যমে। প্রথমে ইসলামের

উপর আক্রমণের পর যখন তাদেরই একপক্ষ বাহ্যত ইসলামের পক্ষ নিল তখন মুসলমানরা তাদেরকে নিজেদের পক্ষের লোক মনে করল এবং তারা সকলে মিলে প্রথমবার করা আপত্তির জবাব দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। জবাব দিতে দিতে তাদের গলদঘর্ম হবার জোগাড়। এর মধ্য দিয়ে তাদের অন্তরে নিজেদের অজান্তেই ‘ইসলাম প্রচারে তরবারীর ভূমিকা নেই’ এই ধারণাটি বদ্ধমূল হয়ে গেল। আক্রমণের জবাবে অতিরিক্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ায় মূল ষড়যন্ত্রটি বোঝার সুযোগ আর তাদের হল না। এভাবে ইসলামের চূড়ান্ত দুশমন এই পাপিষ্ঠরা ‘সাপ হয়ে কাটা ওঝা হয়ে ঝাড়া’ র ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো এবং তাদের বড়সড় একটি লক্ষ্য বাস্তবায়িত হয়ে গেল। (আলমুস্তাশরিকুন ওয়াল ইসলাম, পৃ: ৭৮-৮০)

কাফেরদের উপরোক্ত দ্বিতীয় পক্ষকে মুসলমানরা কতটা নিজেদের পক্ষীয় লোক মনে করেছে এবং তাদের বক্তব্যের সাথে কতটা ঐকমত্য পোষণ করেছে সেটা আপনারা নিম্নোক্ত ব্যাপারটি থেকে আঁচ করতে পারবেন। উপরোক্ত প্রাচ্যবিদ টমাস আর্নল্ডের ‘ইসলামের দিকে আহবান’ বইটা তিন তিনজন আরব মুসলিম আরবীতে ভাষান্তর করে। এমনকি তারা বইয়ের ভূমিকায় ওই নরাধমের প্রশংসায় খেই হারিয়ে ফেলে বলে, “এই বইয়ের লেখক এত বিদগ্ধ পন্ডিত

ও ইতিহাসবিদ যার যথাযথ প্রশংসা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।” (আহাম্মিয়্যাতুল জিহাদ, আলী বিন নুফাঈ, পৃ: ২৪৪)

যাইহোক, এভাবে আক্রমণ, পাল্টা আক্রমণ আর জবাবদানের ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে প্রায় সকল মুসলমানের অন্তরে তারা উল্লিখিত ধারণাটি বসিয়ে দিতে সক্ষম হয়। কিন্তু ইসলামের এ নাদান দোস্তদের শ্লোগানটির উল্টোপিঠ ভেবে দেখার সুযোগ হয়নি। তারা ভেবে দেখেনি, তরবারীর জোরে ইসলাম প্রচার হলে সমস্যা কি? একটা কাফের যে চিরস্থায়ী জাহান্নামের দিকে দ্রুতপদে এগিয়ে যাচ্ছে, তাকে জোর করে মুসলমান বানিয়ে চিরস্থায়ী জান্নাতের পথে নিয়ে আসা- কোনো কাফেরের প্রতি এর চেয়ে বড় অনুগ্রহ আর কি হতে পারে? যাইহোক, কাফেরদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে মুসলমানরাও এই শ্লোগান প্রচার করতে থাকে। ফলে ধীরে ধীরে মুসলমানদের মধ্যে এই ধারণাটি বদ্ধমুল হয়ে যায়। অবস্থা আজ এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে যে, ইসলামের সাথে তরবারীর যে কোনো ভূমিকাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারলেই যেন সেসব নাদান দোস্তরা তৃপ্তিবোধ করেন। ইসলামের মতো মহান ধর্ম থেকে এরকম কালিমা দূর করতে পেরে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলেন, দ্বীনের অনেক বড় খেদমত করে ফেলেছেন বলে মনে করেন। এভাবে

নিজেদের অজান্তেই তারা শত্রুদের মানসিক দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়েন এবং তাদের খেলার ঘুঁটিতে পরিণত হন।

‘তরবারীর জোরে ইসলাম প্রচারিত হয়নি’ কথাটির অর্থ কী এবং সে অর্থ হিসেবে কথাটি ইসলামের সাথে কতটা সাংঘর্ষিক সেটাই এবার দেখব ইনশাআল্লাহ।

তরবারীর জোরে বা শক্তিপ্রয়োগ করে মুসলমান বানানোর অর্থ:-

তরবারীর জোরে মুসলমান বানানোর অর্থ দুটি: ১. কারো ঘাড়ে তরবারী ধরে তাকে ইসলাম গ্রহণের জন্য চাপপ্রয়োগ করা, বলাবাহুল্য ইসলামে এটি বৈধ নয়। আল্লাহ তায়ালার বাণী, لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (ধর্মগ্রহণের ক্ষেত্রে কোন জবরদস্তি নেই -সুরা বাকারা: আয়াত ২৫৬) এর মেসদাক-উদ্দেশ্য এটাই। ইতিহাসে কোন কাফেরকে এভাবে মুসলমান বানানো হয়নি। আর এভাবে মুসলমান বানালে সে আন্তরিকভাবে মুমিন হবেও না, জান বাঁচাতে মুখে কলেমা পড়ে নিলেও বাস্তবে হবে মুনাফিক ।

২. তরবারীর জোরে ইসলাম প্রচারের আরেকটি অর্থ হলো, প্রত্যক্ষভাবে ঘাড়ে তরবারী না ধরে পরোক্ষভাবে কৌশলে চাপপ্রয়োগ করা এবং এমন অবস্থা তৈরী করা যেন

কাফেররা স্বতস্ফূর্তভাবেই মুসলমান হয়ে যায়। এ ধরনের চাপপ্রয়োগ ইসলামে শুধু আছে এতটুকুই নয় বরং এ ধরনের চাপপ্রয়োগ ইসলামী শরিয়তে ফরয করা হয়েছে। এরকম চাপপ্রয়োগের জন্যই ইসলামে আক্রমণাত্মক জিহাদ, জিযয়া ও কাফেরদের যুদ্ধবন্দী করে গোলাম বানানোর আদেশ দেওয়া আছে। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে উলামায়ে উম্মত এ বিধানগুলোর যে হিকমত বর্ণণা করেছেন তা সামনে রাখলেই বিষয়গুলো আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে যাবে। তাই কুরআন-সুন্নাহর উদ্ধৃতি সহ উলামায়ে উম্মতের বক্তব্য থেকে এ বিধানগুলোর হিকমত তুলে ধরার জন্যই আমাদের এই প্রবন্ধের অবতারণা। প্রবন্ধ দীর্ঘ হওয়ার কারণে এ পর্বে এতটুকুতেই শেষ করছি, আগামীতে প্রতিটি বিধানের হিকমত এক বা একাধিক পর্বে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

৬.ইসলাম প্রচারে তরবারীর ভূমিকা (পর্ব-২ আক্রমণাত্মাক জিহাদের হিকমত ও তাৎপর্য)

আক্রমণাত্মাক জিহাদের হিকমত

অনেকেই প্রশ্ন করেন, ইসলাম প্রচারের জন্য জিহাদের কি প্রয়োজন? কাফেরদের দাওয়াত দিলে এবং তাদের সাথে

উত্তম আচরণ করলেই তো তারা মুসলমান হয়ে যাবে। শুধু শুধু যুদ্ধ-বিগ্রহ ও মারামারি-কাটাকাটির কি প্রয়োজন? কিন্তু বাস্তবতা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা মানুষ শুধু হককে না চেনা, সত্য ধর্মকে উপলব্ধি করতে না পারা এ কারণেই সত্যগ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়- বিষয়টা মোটেও এমন নয়, বরং বেশিরভাগ লোকই সত্যকে বুঝার পরেও নানা প্রতিবন্ধকতা ও পারিপার্শ্বিক কারণে সত্যধর্ম গ্রহণ করে না। তাই কাফেরদের যতই দাওয়াত দেওয়া হোক, তাদের সাথে যতই উত্তম আচরণ করা হোক এবং ইসলামের সত্যতা তাদের সামনে যত উজ্জ্বল করেই তুলে ধরা হোক, এর দ্বারা খুব কম সংখ্যক লোকই ইসলাম গ্রহণ করবে। কুরআন থেকে এ বিষয়টা সুস্পষ্টরূপে বুঝে আসে। পুরো কুরআনে একবার সাধারণভাবে নজর বুলিয়ে যে কেউ বুঝতে পারবে, প্রধাণত তিন কারণে মানুষ সত্য ধর্মগ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়,

১. বাপদাদার অন্ধ অনুসরণ। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ (سورة الزخرف:23)

(হে রাসূল) আমি তোমার পূর্বে যখনই কোন জনপদে কোন সতর্ককারী (রাসূল) পাঠিয়েছি, তখন সেখানকার বিত্তবানেরা একথাই বলেছে যে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে

একটা মতাদর্শের অনুসারী পেয়েছি। আমরা তাদেরই পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলছি। -সূরা যুখরুফ, ২৩

২. সত্যধর্ম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অহংকার ও জাত্যভিমান।
প্রত্যেক জাতি সাধারণত নিজেদেরকে অন্য জাতির চেয়ে উত্তম মনে করে, এমনকি যদি তাদের শ্রেষ্ঠত্বের তেমন কোন কারণ না থাকে তথাপিও। (যেমন বর্তমান কাঙ্গাল বাঙ্গালীরা দূর্নীতিতে বিশ্বচ্যাম্পিয়ান হওয়ার পাশাপাশি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে এতটাই অনুন্নত যে, কোন ধরণের মেশিনারি উৎপাদনের সক্ষমতা তাদের নেই। এমনকি সামান্য কেঁচিটাও চীন-পাকিস্তান থেকে আমদানি করতে হয়। তা সত্ত্বেও তারা দিনরাত বাঙ্গালী হওয়ার কারণে নিজেদের বন্দনা গাইতে থাকে।) আর যদি এর সাথে তাদের কিছুটা শক্তি-সামর্থ্যও থাকে তবে তো তারা ধরাকে সরা জ্ঞান করে। অন্য কোন জাতির ধর্ম, বিশেষত যদি সেই ধর্মের অনুসারীরা দুর্বল হয় তবে তা গ্রহণ করা দূরে থাক- তাদের পাত্তাই দিতে চায় না। তাই তাদের নিকট সত্যধর্ম গ্রহণের প্রস্তাব দেওয়া হলে এবং তারা তা সত্য বলে উপলব্ধি করতে পারলেও মেনে নিতে অস্বীকার করে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো ইহুদীরা, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ(146)

“যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা তাকে (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) এতটা ভালোভাবে চেনে যেমন চেনে নিজেদের সন্তানদেরকে।” -সুরা বাকারা, ২৫৭

ফেরআউন ও তার জাতি মূসা আলাইহিস সালামকে সত্য নবী বলে বিশ্বাস করতো। কিন্তু অহংকারের কারণে তারা মুসার আনিত ধর্ম গ্রহণ করেনি। কুরআন তাদের ব্যাপারে বলেছে,

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا (سورة النمل: 14)

“তারা সীমালজ্ঘন ও অহমিকা বশত তা সব অস্বীকার করলো, যদিও তাদের অন্তর সেগুলো (সত্য বলে) বিশ্বাস করে নিয়েছিলো।” -সূরা নামল, ১৪

মক্কার কাফেররা ইসলামের সত্যত্যা উপলব্ধি করা সত্ত্বেও কেবলমাত্র অহংকার ও হঠকারিতা বশতই নবীজির দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন,

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ

“যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা কেবল এ কারণেই তা অবলম্বন করেছে যে, তারা আত্মম্ভরিতা ও হঠকারিতায় লিপ্ত রয়েছে।” (সূরা সোয়াদ, ২ আয়াতের তরজমার জন্য দেখুন,

তাওযীহুল কুরআন, ৩/১৮৬)

আয়াতের তাফসীরে ইমাম আলূসী রহ. বলেন,

وجعلها -يعني كلمة (بل) - بعضُهم للإضراب عما يُفهم مما
من :ذُكر ونحوِه، مِن أن مَن كفر لم يكفر لخلل فيه، فكأنه قيل
كفر لم يكفر لخلل فيه، بل كفر تكبرا عن اتباع الحق وعنادا،
.... وهو أظهر من جعل ذلك إضرابا عن صريحه
ويمكن أن يكون الجواب الذي عنه الإضراب: ما أنت بمقصر
في تذكير الذين كفروا وإظهار الحق لهم، ويشعر به الآيات بعد
وسبب النزول الآتي ذكره إن شاء الله تعالى، فكأنه قيل: "ص
والقرآن ذي الذكر، ما أنت بمقصر في تذكير الذين كفروا
وإظهار الحق لهم، بل الذين كفروا مقصرون في اتباعك
والمراد بالعزة ما يظهرونه من .... "والاعتراف بالحق
الاستكبار عن الحق.(روح المعاني 12/ 156)

সংক্ষেপে এর সারমর্ম হলো, "কাফেররা ইসলামগ্রহণ না করার কারণ এটা নয় যে, কুরআনের মাঝে কোন ত্রুটি রয়েছে, কিংবা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে দাওয়াত দেওয়া এবং তাদের নিকট সত্যকে স্পষ্ট করার ক্ষেত্রে কোন কমতি করেছেন, বরং তারা অহংকারের কারণে সত্যকে বুঝেও গ্রহণ করছে না।" -রুহুল মাআনী, ১২/১৫৭

তেমনিভাবে কুরআন থেকে আমরা জানতে পারি, প্রত্যেক নবীর দাওয়াতের বিরোধীতা নেতৃস্থানীয় অহংকারী লোকেরাই করেছে, তারা নবীদের দাওয়াতকে নিচুশ্রেণীর লোকদের দাওয়াত বলে প্রত্যাখ্যান করেছে, নিচের আয়াতগুলো লক্ষ্য করুন।

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ
(سورة الزخرف31)

“তারা বললো, এ কুরআন দুই জনপদের কোন বড় ব্যক্তির উপর নাযিল করা হল না কেন? (‘দুই জনপদ’ দ্বারা ‘মক্কা মুকাররামা’ ও ‘তায়েফ’ বোঝানো হয়েছে। এতদঞ্চলে এ দু’টিই ছিল বড় শহর। তাই মুশরিকরা বললো, এ দুই শহরের কোন বিত্তবান সর্দারের উপরই কুরআন নাযিল হওয়া উচিত ছিল। (দেখুন, সূরা যুখরুফ, ৩১ তাওযীহুল কুরআন, ৩/২৯৬ আরো দেখুন, সূরা সদ, ৮)

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ (75) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (سورة الأعراف: 76)

“তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক নেতৃবর্গ, যে সকল দুর্বল লোক ইমান এনেছিল, তাদেরকে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কি এটা বিশ্বাস করো যে, সালিহ নিজ প্রতিপালকের পক্ষ হতে

প্রেরিত রাসূল? তারা বললো, নিশ্চয়ই আমরা তো তাঁর মাধ্যমে প্রেরিত বাণীতে ইমান রাখি। সেই দাম্ভিক লোকেরা বললো, তোমরা যে বাণীতে ইমান এনেছো আমরা তো তা প্রত্যাখ্যান করি।” -সূরা আ’রাফ, ৭৬

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَاشُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ (سورة الأعراف: 88)

“তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক সর্দারগণ বললো, হে শুয়াইব! আমরা পাকাপাকিভাবে ইচ্ছা করেছি, তোমাকে ও তোমার সাথে যারা ইমান এনেছে তাদের সকলকে আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেব, অন্যথায় তোমাদের সকলকে আমাদের দ্বীনে ফিরে আসতে হবে। শুয়াইব বললো, আমরা যদি (তোমাদের দ্বীনকে) ঘৃণা করি তবুও কি?”-সূরা আরাফ, ৮৮

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ (سورة هود 27)

“তার সম্প্রদায়ের যারা কুফর অবলম্বন করেছিলো, তারা বলতে লাগলো, আমরা তো তোমাকে আমাদের মতই মানুষ দেখছি, এর বেশি কিছু নয়। আমরা আরও দেখছি তোমার অনুসরণ করছে কেবল সেই সব লোক, যারা আমাদের মধ্যে

সর্বাপেক্ষা গুরুত্বহীন, এবং তাও ভাসা-ভাসা চিন্তার ভিত্তিতে এবং আমরা তোমার মাঝে এমন কিছু দেখতে না, যার কারণে আমাদের উপর তোমার কিছু শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হবে। বরং আমাদের ধারণা তোমরা সকলে মিথ্যাবাদী।" -সূরা হুদ, ২৭

অহংকার সত্যধর্ম গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায় হওয়ার ব্যাপারে কুরআনে শত শত আয়াত রয়েছে। যারা কিছুটা হলেও কুরআন অধ্যয়ন করেন তাদের নিকট বিষয়টা অস্পষ্ট থাকার কথা নয়। তাই এ বিষয়ে আর উদ্ধৃতি বাড়িয়ে প্রবন্ধ দীর্ঘ করতে চাচ্ছি না।

৩. রাজা-বাদশাহ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের অনুসরণ। মানুষ সাধারণভাবেই রাজা-বাদশাহদের অনুসরণ করে, বিজয়ী জাতি ও প্রভাবশালী লোকদের কথা অনুযায়ী চলে। তেমনিভাবে রাজা-বাদশাহ ও শক্তিশালী জাতিবর্গও অধীনস্ত ও দুর্বলদের কৌশলে ও চাপপ্রয়োগ করে তাদের ধর্মের অনুসারী বানিয়ে রাখে, এ ব্যাপারে অনেক আয়াত ও হাদিস রয়েছে, উদাহরণস্বরুপ দুয়েকটি উল্লেখ করছি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. (سورة إبراهيم : 21)

"সমস্ত মানুষ আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে। যারা (দুনিয়ায়) দুর্বল ছিল, তারা বড়ত্ব প্রদর্শনকারীদেরকে বলবে, আমরা তো তোমাদেরই অনুগামী ছিলাম। এখন কি তোমরা আমাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে একটু বাঁচাবে?" -সূরা ইবরাহীম, ২১

কিয়ামতের দিন কাফেররা বলবে,

رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا (سورة الأحزاب : 67)

'হে আমাদের প্রতিপালক! প্রকৃতপক্ষে আমরা আমাদের নেতৃবর্গ ও আমাদের গুরুজনদের আনুগত্য করেছিলাম, তারাই আমাদেরকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করেছে। ফলে তারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছে। -সূরা আহযাব, আয়াত: ৬৭ (আরো দেখুন, সূরা গাফির, ৪৭)

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন-

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ) سورة الصافات : 27 - 28(

তারা একে অন্যের অভিমুখী হয়ে পরস্পরে সওয়াল-জওয়াব করবে। (অধিনস্তরা তাদের নেতৃবর্গকে) বলবে, তোমরাই তো অত্যন্ত শক্তিমানরূপে আমাদের কাছে আসতে। (অর্থাৎ আমাদের উপর চাপ সৃষ্টি করতে যেন আমরা কিছুতেই ইমান আনি। (সুরা সাফফাত, ২৭-২৮ তাওযীহুল কুরআন, আল্লামা তাকী উসমানী ৩/১৬১-১৬২)

আল্লাহ তায়ালা আরো ইরশাদ করেন,

وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ (سورة سبأ31)

"তুমি যদি সেই সময়ের দৃশ্য দেখতে যখন যালেমদেরকে তাদের প্রতিপালকের সামনে দাঁড় করানো হবে আর তারা একে অন্যের কথা রদ করবে। (দুনিয়ায়) যাদেরকে দুর্বল মনে করা হয়েছিল তারা ক্ষমতা-দর্পীদেরকে বলবে, তোমরা না হলে আমরা অবশ্যই মুমিন হয়ে যেতাম।" –সূরা সাবা, ৩১

এ মর্মে কয়েকটি হাদীস

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কায়সারের নিকট প্রেরিত দাওয়াতি পত্রে লিখেন,

أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين

‘ইসলাম গ্রহণ করো, শান্তি পাবে। আল্লাহ তায়ালা তোমাকে বহুগুণ সওয়াব দান করবেন। আর যদি তুমি (ইসলাম থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে জনসাধারণের (ইসলাম গ্রহণ না করার) গুনাহও তোমার উপর বর্তাবে। -সহিহ বুখারী: ৭ সহিহ মুসলিম: ১৭৭৩

এ হাদিসের ব্যাখায় হাফেয ইবনে হাজার রহ. ফাতহুল বারীতে বলেন,

قال الخطابي: أراد أن عليك إثم الضعفاء والأتباع إذا لم يسلموا تقليدا له لأن الأصاغر أتباع الأكابر. (فتح الباري: 1/39 ط. دار المعرفة)

“খত্তাবী রহ. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য হলো, যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ না করো তাহলে তোমার অনুসারী ও দুর্বল প্রজাদের ইসলাম গ্রহণ না করার গুনাহের ভারও তোমার উপর বর্তাবে। কেননা তারা তোমার

অনুসরণ করেই ইসলাম গ্রহণ করবে না। কারণ দুর্বলরা প্রভাবশালীদের অনুসরণই করে থাকে।” -ফাতহুল বারী: ১/৩৯

ইমাম বুখারী কায়েস বিন আবী হাযেম থেকে বর্ণণা করেন,

دخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها زينب، ... قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال: «بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم»، قالت: وما الأئمة؟ قال: «أما كان لقومك رءوس وأشراف، يأمرونهم فيطيعونهم؟» قالت: بلى، قال: «فهم أولئك على الناس». صحيح البخاري (3834)

আবু বকর রাযিআল্লাহু আনহু একদিন আহমাস গোত্রের যয়নাব নামী এক মহিলার সাথে সাক্ষাৎ হয়। .... মহিলা তাকে প্রশ্ন করে, জাহেলী যমানার পর যে উত্তম দীন ও কল্যাণময় জীবন বিধান আল্লাহ তায়ালা আমাদের দান করেছেন, সে দীনের উপর আমরা কতদিন সঠিকভাবে টিকে থাকতে পারবো? আবু বকর রাযি. বললেন, যতদিন তোমাদের নেতৃবর্গ তোমাদের নিয়ে দীনের উপর অবিচল থাকবেন। মহিলা জিজ্ঞাসা করলো, নেতৃবর্গ কারা? আবু বকর রাযিআল্লাহু বললেন, তোমার গোত্রে কি এমন সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় লোক নেই, যাদের আদেশ-নিষেধ মানুষ মেনে

চলে? মহিলা উত্তর দিল, হাঁ, আছে। আবু বকর বললেন, তারাই নেতৃবর্গ। -সহিহ বুখারী, ৭/৩৭৩ ইসলামী ফাউন্ডেশন

হাদিসের ব্যাখায় হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেন,

أئمتكم» أي لأن الناس على دين ...قوله: «ما استقامت بكم
ملوكهم، فمن حاد من الأئمة عن الحال مال وأمال. (فتح
ط: دار الفكر، مصور عن الطبعة السلفية151 : 7الباري).

“(তোমরা ইসলামের উপর থাকবে) যতদিন তোমাদের নেতৃবর্গ তোমাদের নিয়ে দীনের উপর অবিচল থাকবেন”, কেননা মানুষ তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অনুসরণ করে, সুতরাং নেতৃস্থানীয় কোন ব্যক্তি সঠিক পথ থেকে সরে গেলে সে নিজেও পথভ্রষ্ট হয়, মানুষকেও পথভ্রষ্ট করে।” ফাতহুল বারী, ৭/১৫১

উপরোক্ত আলোচনা হতে বুঝা গেল, হক বুঝার পরও গোঁড়ামি-অহংকার, বাপ-দাদা ও নেতাদের অনুসরণ বা কুফরী ধর্ম বিজয়ী হওয়ার কারণে বেশীরভাগ লোক ইসলাম গ্রহণ করে চিরস্থায়ী শান্তির পথে আসে না। এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করার নিমিত্তে ইসলাম ইকদামী তথা

আক্রমণাত্মক জিহাদের নির্দেশ দিয়েছে এবং কাফেরদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের হত্যা করার পাশাপাশি যুদ্ধে সক্ষম সাধারণ কাফেরদেরও ব্যাপকভাবে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছে, যেন ওদের শক্তি সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায়। এরপর ওদেরকে লাঞ্ছিত-অপদস্থ করে জিযয়া গ্রহণের কিংবা বন্দী করে দাস-দাসী বানানোর আদেশ দিয়েছে। তখন অন্যদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধাপ্রদান করার মতো কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও থাকবে না এবং নিজেদের গর্ব ও জাত্যভিমানও ওদের ইসলাম গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না। বরং তখন তারা লাঞ্ছনা হতে মুক্তির জন্য বাপদাদার অন্ধ অনুসরণ ছেড়ে ইসলাম গ্রহণে সম্মত হয়ে যাবে।

উপরোক্ত বিধানগুলোর বাস্তব ফলাফল আমরা ইতিহাসে সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাই যে, যখনই মুসলমানরা যুদ্ধ করে কাফেরদের দেশ দখল করে নেয়, তাদের প্রভাবশালী লোকদের হত্যা করে এবং ইসলাম বিজয়ী ধর্ম হিসেবে আভির্ভূত হয় তখন খুব সহজেই মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে। এ ব্যাপারে *সুরা নাসরের আয়াতগুলো সবচেয়ে উৎকৃষ্ট প্রমাণ। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (2) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ

‘যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং তুমি মানুষকে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে দেখবে, তখন তুমি আল্লাহর প্রশংসা সহ তাসবীহ পাঠ করবে। -সুরা নাসর, আয়াত : ১-৩

আয়াতে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, বিজয়ের দ্বারা দ্রুততম সময়ে বিপুল পরিমান মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে।

সামনে কয়েকটি আয়াতের তাফসীরসহ উলামায়ে কেরামের আরো কিছু বক্তব্য তুলে ধরছি যেগুলোতে ইকদামী জিহাদ, নেতৃস্থানীয় কাফেরদেরকে হত্যা করার উপকারিতা ও পরোক্ষ চাপপ্রয়োগের ব্যাপারটি খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। সম্মানিত পাঠকদের মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করার সবিনয় অনুরোধ করছি।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

“তোমরা সর্বোত্তম উত্তম, তোমাদের বের করা হয়েছে মানুষের কল্যাণার্থে। তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজে বাধা দিবে এবং আল্লাহর প্রতি ইমান আনবে।” -সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১১০

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

السؤال الأول: من أي وجه يقتضي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله كون هذه الأمة خير الأمم مع أن هذه الصفات الثلاثة كانت حاصلة في سائر الأمم؟.

والجواب: قال القفال: تفضيلهم على الأمم الذين كانوا قبلهم إنما حصل لأجل أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بآكد الوجوه وهو القتال لأن الأمر بالمعروف قد يكون بالقلب وباللسان وباليد، وأقواها ما يكون بالقتال، لأنه إلقاء النفس في خطر القتل وأعرف المعروفات الدين الحق والإيمان بالتوحيد والنبوة، وأنكر المنكرات: الكفر بالله، فكان الجهاد في الدين محملا لأعظم المضار لغرض إيصال الغير إلى أعظم المنافع، وتخليصه من أعظم المضار، فوجب أن يكون الجهاد أعظم العبادات، ولما كان أمر الجهاد في شرعنا أقوى منه في سائر الشرائع، لا جرم صار ذلك موجبا لفضل هذه الأمة على سائر الأمم، وهذا معنى ما روي عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية: قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرونهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقروا بما أنزل الله، وتقاتلونهم عليه و «لا إله إلا الله» أعظم المعروف، والتكذيب هو أنكر المنكر.

ثم قال القفال: فائدة القتال على الدين لا ينكره منصف، وذلك لأن أكثر الناس يحبون أديانهم بسبب الألف والعادة، ولا يتأملون في الدلائل التي تورد عليهم فإذا أكره على الدخول في الدين بالتخويف بالقتل دخل فيه، ثم لا يزال يضعف ما في قلبه من حب الدين الباطل، ولا يزال يقوى في قلبه حب الدين الحق إلى أن ينتقل من الباطل إلى الحق، ومن استحقاق العذاب الدائم إلى

استحقاق الثواب الدائم. (الفتسير الكبير: 8/324 دار إحياء التراث العربي)

প্রশ্ন: সৎকাজের আদেশ, অসৎ কাজে বাধা দেওয়া এবং আল্লাহর প্রতি ইমান আনা কিভাবে সর্বোত্তম জাতি হওয়ার মাধ্যম হলো, অথচ এ গুণাবলী তো সব উম্মতের মধ্যেই বিদ্যমান ছিল?

উত্তর: কাফফাল রহ. বলেন, অন্যান্য উম্মতের উপর এ উম্মতকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণ হলো এ উম্মত সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ সবচেয়ে কার্যকরী পন্থা তথা যুদ্ধের মাধ্যমে করবে, কেননা সৎকাজের আদেশ অন্তর, মুখ, ও হাতের মাধ্যমেও হয়, কিন্তু তা সবচেয়ে কার্যকরীভাবে হয় যুদ্ধের মাধ্যমে, কেননা এতে নিহত হওয়ার আশংকা থাকে। আর সবচেয়ে বড় সৎকাজ হলো সত্য ধর্ম এবং তাওহিদ ও নবুওয়াতের প্রতি ইমান আনা। আর সবচেয়ে বড় অন্যায় হলো কুফর। সুতরাং ধর্মের জন্য জিহাদ হলো অন্যকে সবচেয়ে বড় কল্যাণের পথে নিয়ে আসা এবং সবচেয়ে ক্ষতিকর বিষয় থেকে বাঁচানোর জন্য নিজেকে সবচেয়ে বড় ক্ষতির সম্মুখীন করা। এ কারণেই জিহাদ সবচেয়ে বড় ইবাদত। আর যেহেতু আমাদের ধর্মে পূর্ববর্তী ধর্মের তুলনায় জিহাদের গুরুত্ব বেশি তাই এই জিহাদই অন্যান্য উম্মতের উপর আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ।

এ বিষয়টিই ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি এ আয়াতের ব্যাখায় বলেন, ‘তোমরা সর্বোত্তম জাতি, যাদের উত্থান হয়েছে মানুষের কল্যাণার্থে। তোমরা মানুষকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য দেওয়ার এবং আল্লাহর নাযিলকৃত বিধিবিধান মেনে নেওয়ার আদেশ দিবে, এজন্য তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহার সাক্ষ্যপ্রদান হলো সবচেয়ে বড় সৎকাজ আর কুফর হলো সবচেয়ে মন্দ কাজ।’

এরপর কফফাল বলেন, দীনের জন্য যুদ্ধ করার উপকারিতা কোন ন্যায়পরায়ণ মানুষ অস্বীকার করতে পারে না। কেননা অধিকাংশ মানুষই ঘনিষ্টতা ও অভ্যাসের কারণে নিজের ধর্মকে ভালোবাসে, এবং (ইসলামের সত্যতার ব্যাপারে) তাদের সামনে যে দলিল পেশ করা হয় তা নিয়ে তারা চিন্তাভাবনা করে না। যখন তাদেরকে হত্যার ভয় দেখিয়ে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করানো হয় তখন সে ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর তাদের অন্তরে বাতিল ধর্মের প্রতি লালিত ভালোবাসা ধীরে ধীরে দুর্বল হতে থাকে এবং সত্য ধর্মের ভালোবাসা দৃঢ় হতে থাকে। ফলে এক পর্যায়ে তারা বাতিল ধর্ম ছেড়ে সত্য ধর্মকে আপন করে নেয় এবং চিরস্থায়ী শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে চিরস্থায়ী পুরস্কার লাভের হকদার হয়। - তাফসীরে রাযী: ৮/৩২৪

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী রহ. বলেন,

اعلم أن أتم الشرائع وأكمل النواميس هو الشرع الذي يؤمر فيه بالجهاد، وذلك لأن تكليف الله عباده بما أمر ونهى - مثله كمثل رجل مرض عبيده، فأمر رجلا من خاصته أن يسقيهم دواء، فلو أنه قهرهم على شرب الدواء، وأوجره في أفواههم لكان حقا، لكن الرحمة اقتضت أن يبين لهم فوائد الدواء؛ ليشربوه على رغبة فيه، وأن يخلط معه العسل؛ ليتعاضد فيه الرغبة الطبيعية والعقلية.

ثم إن كثيرا من الناس يغلب عليهم الشهوات الدنية والأخلاق السبعية ووساوس الشطان في حب الرياسات، ويلصق بقلوبهم رسوم آبائهم، فلا يسمعون تلك الفوائد، ولا يذعنون لما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتأملون في حسنة، فليست الرحمة في حق أولئك أن يقتصر على إثبات الحجة عليهم، بل الرحمة في حقهم أن يقهروا؛ ليدخل الإيمان عليهم على رغم أنفهم بمنزلة إيجاد الدواء المر، ولا قهر إلا بقتل من له منهم بكناية شديدة وتمنع قوى، أو تفريق منعتهم وسلب أموالهم حتى يصيروا لا يقدرون على شيء، فعند ذلك يدخل أتباعهم وذراريهم في الإيمان برغبة وطوع، ولذلك كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيصر كان عليك إثم الأريسيين.

وربما كان أسرهم وقهرهم يؤدي إلى إيمانهم، وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل.

وأيضا فالرحمة التامة الكاملة بالنسبة إلى البشر أن يهديهم الله إلى الاحسان، وأن يكبح ظالمهم عن الظلم، وأن يصلح ارتفاقاتهم وتدبير منزلهم وسياسة مدينتهم، فالمدن الفاسدة التي يغلب عليها نفوس السبعية، ويكون لهم تمنع شديد إنما هو بمنزلة الأكلة في بدن الإنسان لا يصح الإنسان إلا بقطعه، والذي يتوجه إلى إصلاح مزاجه وإقامة طبيعته لا بد له من القطع، والشر القليل إذا كان مفضيا إلى الخير الكثير واجب فعله،

ولك عبرة بقريش ومن حولهم من العرب كانوا أبعد خلق الله
عن الاحسان وأظلمهم على الضعفاء، وكانت بينهم مقاتلات
شديدة، وكان بعضهم يأسر بعضا، وما كان أكثرهم متأملين في
الحجة ناظرين في الدليل فجاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم
وقتل أشدهم بطشا وأحدهم نفسا حتى ظهر أمر الله، وانقادوا له،
فصاروا بعد ذلك من أهل الإحسان، واستقامت أمورهم، فلو لم
يكن في الشريعة جهاد أولئك لم يحصل اللطف في حقهم. (حجة
الله البالغة: 2/264 ط. دار الجيل 1426 هـ)

"সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ শরিয়ত তাই যাতে জিহাদের বিধান রয়েছে। কেননা আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের যে আদেশ-নিষেধ দিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত হলো ঐ ব্যক্তির মতো যার গোলামরা অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাই সে তার ঘনিষ্ঠ কাউকে গোলামদের ওষুধ খাওয়াতে বলে, এখন যদি সেই ব্যক্তি ওদেরকে ওষুধ খেতে বাধ্য করে এবং (জোরপূর্বক) তাদের মুখে ওষুধ ঢেলে দেয় তাহলে তা ভালো কাজই হবে। কিন্তু রহমতের তাকাযা হলো তাদেরকে ওষুধের উপকারিতা বুঝিয়ে দেওয়া, যেন তারা সাগ্রহে তা সেবন করে, এবং ওষুধের সাথে মধু মিশিয়ে দেওয়া যেন বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রহের পাশাপাশি স্বভাবগত আগ্রহও সৃষ্টি হয় এবং একটি অপরটিকে শক্তিশালী করে।

কিন্তু অনেক মানুষের উপর নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, পশুত্ব ও শয়তানের কুমন্ত্রণা প্রবল হয়ে যায়, এবং তাদের অন্তর

বাপ-দাদার আচার-রীতির প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। তাই তারা (ইসলামের ধর্মের) উপকারিতাগুলো শুনতে চায় না, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আদেশ দেন তা মেনে নেয় না, কল্যাণকর বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করে না। সুতরাং তাদের ক্ষেত্রে শুধু ইসলামের সত্যত্যার প্রমাণ পেশ করাই যথেষ্ট নয়। বরং রহমতের তাকাযা হলো তাদেরকে পর্যুদস্ত করা হবে যেন ইমান তাদের অন্তরে প্রবেশ করে, অনেকটা (জোরপূর্বক) তিক্ত ওষুধ পান করানোর মত। আর তাদেরকে পর্যুদস্ত করার পদ্ধতি হলো তাদের মধ্যে যারা শক্তিশালী ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী তাদের হত্যা করা হবে কিংবা তাদের দলকে বিক্ষিপ্ত করে দেওয়া হবে এবং ধনসম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া হবে, যেন (ইসলামের বিপক্ষে) তাদের কোমর সোজা করে দাঁড়ানোর মত কোন শক্তিই অবশিষ্ট না থাকে। তখন তাদের অনুসারী ও সন্তান-সন্ততিরা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করবে। এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কায়সারের নিকট প্রেরিত চিঠিতে লিখেন, (যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ না কর) তাহলে তোমাকে তোমার অনুসারীদের (ইসলাম গ্রহণ না করার) গুনাহের ভারও বহন করতে হবে।

কখনো তাদেরকে বন্দী ও পর্যুদস্ত করা তাদের ইমানের কারণ হয়। এ দিকে ইঙ্গিত করেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل

‘আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তিদের দেখে অবাক হন যাদেরকে শিকলেবন্দী করে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়’। [সহিহ বুখারী: ৩০১০]

তাছাড়া এটাও মানবজাতির প্রতি রহমতের দাবী যে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তাদেরকে (একে অপরের প্রতি) অনুগ্রহ করার দিকে পথপ্রদর্শন করবেন, যালেমদের যুলুম হতে বিরত রাখবেন, এবং মানুষের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, ও শহর-নগর পরিচালনার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু যে শহরগুলোর ক্ষমতা মন্দ লোকেরা দখল করে নেয় এবং তাদের প্রতাপ ও শক্তি থাকে তারা মানব দেহের পচনশীল ক্ষতের ন্যায়, তা কেটে ফেলা ব্যতীত মানুষ সুস্থতা লাভ করতে পারে না। চিকিৎসক তা কেটে ফেলতে বাধ্য। কেননা সামান্য ক্ষতির বিনিময়ে প্রভুত কল্যাণ অর্জন করা গেলে তো সেই ক্ষতিকে মেনে নিতেই হয়।

এ ব্যাপারে কুরাইশ ও তাদের পার্শ্ববর্তী আরবদের ঘটনা আমাদের জন্য দৃষ্টান্ত। তারা একে অপরের প্রতি অনুগ্রহ করা থেকে যোজন যোজন দূরে ছিল। দুর্বলদের উপর সবচেয়ে বেশি জুলুম করত। পরস্পর ঘোরতর যুদ্ধ লিপ্ত হতো, একে অপরকে বন্দী করত। তাদের অধিকাংশই

দলিল-প্রমাণ নিয়ে চিন্তাভাবনা করতো না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে জিহাদ করলেন এবং তাদের মধ্যে যারা প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ছিল তাদের হত্যা করলেন। ফলে আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী হলো এবং কুরাইশ ও অন্যান্য আরবরা রাসূলের অনুগত হয়ে একে অপরের প্রতি অনুগ্রহশীল হয়ে গেল। তাদের অবস্থার সংশোধন হয়ে গেল। যদি শরিয়তে তাদের সাথে যুদ্ধের আদেশ না থাকতো তাহলে তাদের প্রতি দয়া করা হতো না।” -হুজ্জাতুল্লাহির বালেগা: ২/২৬৪

নেতৃস্থানীয় কাফেরদের হত্যা করার ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহয় উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ “তোমরা কুফর নেতৃবর্গের সাথে যুদ্ধ করো।” -সূরা তাওবা, আয়াত, ১২

বদরের যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করলে আবু বকর রাযি. তাদের থেকে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দিতে বলেন, কিন্তু উমর রাযি. বলেন,

أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكني من فلان نسيبا لعمر، فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها

‘আমার মত হলো, আমরা নিজ হাতে তাদেরকে হত্যা করবো, আলী তার ভাই আকীলকে হত্যা করবে, এবং আমি আমার আত্মীয় অমুককে হত্যা করবো। কেননা এরাই কুফরীর নেতৃবর্গ’। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবুবকরের পরামর্শ গ্রহণ করে বন্দীদের মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেন। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়,

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ

“কোন নবীর পক্ষে এটা শোভনীয় নয় যে, যমিনে (শত্রুদের) রক্ত ব্যাপকভাবে প্রবাহিত করার পূর্বে তার কাছে কয়েদী থাকবে।” -সূরা আনফাল, আয়াত: ৬৭

অর্থাৎ কাফেরদের পাইকারী হারে হত্যা করে তাদের শক্তি খর্ব করতে হবে এবং ওদের মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিতে হবে, যেন ওরা মুসলমানদের বিপক্ষে আর কখনো কোমর সোজা করে দাঁড়াতে না পারে। এর পূর্ব পর্যন্ত ওদেরকে বন্দী করা এবং মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার অবকাশ নেই। এ বিষয়টিই অপর আয়াতে সুস্পষ্টরূপে এসেছে, ইরশাদ হয়েছে,

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً

“কাফেরদের সাথে তোমাদের মোকাবেলা হলে তাদের গর্দান উড়াতে থাকো। অবশেষে যখন তোমরা তাদেরকে ব্যাপকভাবে হত্যা করবে তখন তাদেরকে (বন্দী করে)

শক্তভাবে বাঁধবে। তারপর হয়তো (তাদেরকে) মুক্তি দিবে অনুকম্পা দেখিয়ে অথবা মুক্তিপণ নিয়ে।" -সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ৪

ইবনে কাসীর রহ. বলেন,

أي: إذا واجهتموهم فاحصدوهم حصدا بالسيوف

অর্থাৎ তোমরা শত্রুদের মুখোমুখী হলে তাদের কচুকাটা করো। -তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৭/৩০৭

আয়াতটির তাফসীর করতে গিয়ে ইমাম জাসসাস রহিমাহুল্লাহু বলেন,

لأن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالإثخان في القتل وحظر عليه الأسر - إلا بعد إذلال المشركين وقمعهم - وكان ذلك وقت قلة عدد المسلمين وكثرة عدد عدوهم من المشركين، فمتى أثخن المشركون وأذلوا بالقتل والتشريد جاز الاستبقاء.
أحكام القرآن: 5 : 269 ط. دار إحياء التراث العربي: 1405 (هـ)

"আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে প্রচুর পরিমাণে রক্তপাত করতে বলেছেন এবং মুশরিকদের লাঞ্ছিত করা ও তাদের শক্তি খর্ব করার পূর্বে বন্দী করতে নিষেধ করেছেন, ...

সুতরাং মুশরিকদের পাইকারীহারে হত্যা করা, ওদেরকে হত্যা ও নির্বাসনের মাধ্যমে অপদস্থ করার পরই ওদেরকে জানে বাঁচানো জায়েয হবে।”-আহকামুল কুরআন, ৫/২৬৯

গত শতাব্দীর বরেণ্য আলেম শায়েখ আব্দুর রহমান সা’দী বলেন,

يقول تعالى مرشدا عباده إلى ما فيه صلاحهم، ونصرهم على أعدائهم {فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} في الحرب والقتال، فاصدقوهم القتال، واضربوا منهم الأعناق، حَتَّى تثخنوهم وتكسروا شوكتهم وتبطلوا شرتهم، فإذا فعلتم ذلك، ورأيتم الأسر أولى وأصلح، فَشُدُّوا الْوَثَاقَ} أي: الرباط، وهذا احتياط لأسرهم لئلا يهربوا، } فإذا شد منهم الوثاق اطمأن المسلمون من هربهم ومن شرهم، فإذا كانوا تحت أسركم، فأنتم بالخيار بين المن عليهم، وإطلاقهم بلا مال ولا فداء، وإما أن تفدوهم بأن لا تطلقوهم حتى يشتروا أنفسهم، أو يشتريهم أصحابهم بمال، أو بأسير مسلم عندهم.

(تفسير السعدي ص 784 ط. مؤسسة الرسالة)

‘আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের কল্যাণ এবং শত্রুদের উপর বিজয়ী হওয়ার পদ্ধতি বাতলে দিচ্ছেন। তিনি বলছেন, যখন যুদ্ধে তোমরা কাফেরদের মুখোমুখি হও তখন ওদের বিরুদ্ধে বীরবিক্রমে যুদ্ধ কর, ওদের গর্দান উড়াতে থাকো, যতক্ষণ না তাদেরকে ব্যাপকহারে হত্যা করে তাদের শক্তি খর্ব করতে পার এবং তাদের অনিষ্ট হতে তোমরা নিরাপদ হয়ে

যাও। এরপর তোমাদের নিকট বন্দী করা ভালো মনে হলে তাদের কষে বাধো। কষে বাধতে বলা হয়েছে যেন ওরা পলায়ন করতে না পারে এবং মুসলমানরা তাদের পলায়ন ও অনিষ্ট হতে নিরাপদ হয়ে যায়। বন্দী করার পর তোমাদের ইখতিয়ার থাকবে তোমরা চাইলে তাদের উপর অনুগ্রহ করে মুক্তিপণ ব্যতিতই তাদের ছেড়ে দিতে পারো আর চাইলে তাদের থেকে মুক্তিপণ নিতে কিংবা তাদের মাধ্যমে বন্দী বিনিময় করতে পারো।" -তাফসীরে সা'দী, পৃ: ৭৮৪

হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. ও একই তাফসীর করেছেন, তিনি বলেন,

تمهارا جب کفار سے مقابله هو جائے تو ان کي گردنيں مارو (يعني قتل کرو) يها ں تك کے جب تم ان کي خوب خون جس کي حد يه هے کے اب اگر قتل)ريزي کر چکو موقوف کر کے بجائے اس کے قيد پر اکتفاء کيا جائے تو محتمل مضرتِ مسلمين وغلبہ کفار نه هو) تو (اس وقت کفار کو قيد کر کے) خوب مضبوط باندھ لو پھراس کے بعد (على سبيل منع الجمع تم کو دو باتو کا اختيار هے) يا تو بلا بيان)معاوضه چهوڑ دينا اور يا معاوضه لے کر چهو ڑدينا (القرآن: 3/409)

"কাফেরদের সাথে তোমাদের যুদ্ধ হলে তোমরা তাদের হত্যা

করো, যখন তোমরা তাদের প্রচুর পরিমানে হত্যা করবে (যার সীমা হলো এখন তাদের হত্যা করার পরিবর্তে বন্দী করা হলেও কাফেরদের বিজয় কিংবা তাদের দ্বারা মুসলমানদের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না) তখন তাদের বন্দী করে মযবুত ভাবে বাধো। এরপর হয়তো বিনামূল্যে ছেড়ে দিবে কিংবা মুক্তিপণ নিয়ে ছাড়বে।" -বয়ানুল কুরআন ৩/৪০৯

শাইখুল ইসলাম আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ. বলেন,

یعنی حق اورباطل کا مقابلہ تو رہتا ہی ہے۔ جس وقت مسلمانوں اور کافروں میں جنگ ہو جائے تو مسلمانوں کو پوری مضبوطی اور بہادری سے کام لینا چاہئے۔ باطل کا زور جب ہی ٹوٹے گا کہ بڑے بڑے شریر مارے جائیں اور انکے جتھے توڑ دیے جائیں۔ اس لئے ہنگامہ کارزار میں کسل، سستی، بزدلی اور توقف و تردد کو راہ نہ دو۔ اور دشمنان خدا کی گردنیں مارنے میں کچھ باک نہ کرو۔ کافی خونریزی کے بعد جب تمہاری دھاک بیٹھ جائے اور ان کا زور ٹوٹ جائے اس وقت قید کرنا بھی کفایت کرتا ہے۔ قال تعالی: [مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ] یہ قید وبند ممکن ہے ان کے لئے تازیانہ عبرت کا کام دے اور مسلمانوں کے پاس رہ کر انکو اپنی اور تمہاری حالت کے جانچنے اور اسلامی تعلیمات میں غور کرنے کا موقع بہم پہنچائے شدہ شدہ وہ لوگ حق و صداقت کا راستہ اختیار کر لیں۔ یا مصلحت سمجھو تو بدون کسی معاوضہ کے ان پر احسان کر کے قید سے رہا کرو۔ اس صورت میں بہت

سے افراد ممکن ہے تمہارے احسان اور خوبی اخلاق سے متاثر ہو کر تمہاری طرف راغب ہوں اور تمہارے دین سے محبت کرنے لگیں۔ اور یہ بھی کر سکتے ہو کہ زر فدیہ لے کر یا مسلمان قیدیوں کے مبادلہ میں ان قیدیوں کو چھوڑ دو اس میں کئ طرح کے فائدے ہیں۔ بہرحال اگر ان اسیران جنگ کو انکے وطن کی طرف واپس کر و تو دو ہی صورتیں ہیں۔ معاوضہ میں چھوڑنا یا بلامعاوضہ رہا کرنا۔ ان میں جو صورت امام کے نزدیک اصلح ہو اختیار کر سکتا ہے۔ حنفیہ کے ہاں بھی فتح القدیر اور شامی وغیرہ میں اس طرح کی روایات موجود ہیں ہاں اگر قیدیوں کو ان کے وطن کی طرف واپس کرنا مصلحت نہ ہو تو پھر تین صورتیں ہیں۔ ذِمّی بنا کر بطور رعیت کے رکھنا یا غلام بنا لینا، یا قتل کر دینا۔ (فوائد عثماني ص 217-216 ط. فريد بك ڈپو)

"অর্থাৎ হক ও বাতিলের লড়াই তো চিরন্তন। সুতরাং মুসলামনদের কাফেরদের সাথে যুদ্ধের সময় বীরত্বের সাথে অটল থেকে যুদ্ধ করতে হবে। বাতিলের শক্তি তখনই খর্ব হবে যখন ধাড়ি শয়তানগুলোকে হত্যা করা হবে এবং তাদের বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হবে।
তাই কাফেরদের সাথে যুদ্ধে ভীরুতা বা দ্বিধাদ্বন্দ্ব করো না এবং তাদের গর্দান উড়াতে ভয় করো না। যথেষ্ট পরিমান রক্তপাত করার পর যখন কাফেরদের অন্তরে তোমাদের ভয় জমে যায় এবং কাফেরদের শক্তি খর্ব হয়ে যায় তখন বন্দী করাও যথেষ্ট। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "কোন নবীর পক্ষে

এটা শোভনীয় নয় যে, যমিনে (শত্রুদের) রক্ত ব্যাপকভাবে প্রবাহিত করার পূর্বে তার কাছে কয়েদী থাকবে।”
এই বন্দীত্ব তাদের জন্য উপদেশ ও দৃষ্টান্ত হতে পারে। পাশাপাশি মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে তাদের জীবনাচার প্রত্যক্ষ করা এবং ইসলামের শিক্ষা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার সুযোগ হবে, ধীরে ধীরে তারা ইসলাম গ্রহণ করবে। আর যদি ভালো মনে করো তাহলে মুক্তিপণ ব্যতীত বা মুক্তিপণ নিয়ে তাদের ছেড়ে দিতে পারো। এতে অনেকেই তোমাদের অনুগ্রহ ও উত্তম চরিত্র দেখে তোমাদের ধর্মের প্রতি আগ্রহী হবে এবং তোমাদের মহব্বত করবে ।” -তাফসীরে উসমানী: পৃ: ২১৬-২১৭

দেখুন, কাফেরদের সাথে শুধু দাওয়াত ও উত্তম আচরণই যদি তাদের ইসলাম গ্রহণের জন্য যথেষ্ট হতো তাহলে নবীজির দশ বছরের দাওয়াতে মক্কাবাসীরা মুসলিম হলো না কেন? রাসূল কি -নাউযুবিল্লাহ- তাদের দাওয়াতের ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি করেছেন, না তাদের সাথে উত্তম আচরণ করেননি? আসলে দয়া-উত্তম আচরণের দ্বারা কাজ হয় বিজয়ী হওয়া, বন্দী করা ও দাসদাসী বানানোর পরে। কেননা বিজয়ী জাতি ও মনিবরা যখন বিজিত জাতি, তাদের যুদ্ধ বন্দী ও দাসদাসীদের প্রতি দয়া করে তখন তা তাদের উত্তম আখলাক ও নৈতিকতার পরিচয় হয়। এজন্যই যখন

মক্কা বিজয়ের পরে রাসূল কাফেরদের প্রতি অনুগ্রহ করে তাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিলেন তখন তারা খুব দ্রুত মুসলমান হয়ে যায়। পক্ষান্তরে পরাজিত জাতি বিজয়ী জাতির সাথে উত্তম আচরণ করলে সেটা তাদের উত্তম আখলাকের দলিল হওয়া তো দূরে থাক, বরং অনেক সময়ই বিজয়ীরা মনে করে তারা আমাদের শক্তির ভয়ে ভীত হয়ে তোষামোদ স্বরুপ উত্তম আচরণ করছে। তাই বিজয়ের পূর্বে উত্তম আচরণ তেমন ফলদায়ক হয় না।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে পাঠক আপনি নিজেই বিবেচনা করুন ইসলাম প্রচারে তরবারীর ভূমিকা আছে কি না এবং থাকলে তার মাত্রা কতখানি। আরো দেখুন কৌশলে তাদের উপর ইসলাম গ্রহণের চাপপ্রয়োগ করা হচ্ছে কি না।

চলবে ইনশাআল্লাহ।

প্রথম পর্বের লিংক-

https://dawahilallah.com/showthread....%26%232488%3B)

৭.ইসলাম প্রচারে তরবারীর ভূমিকা (তৃতীয় পর্ব, জিযয়ার বিধানের হিকমত ও তাৎপর্য)

কাফেরদের থেকে জিযয়া গ্রহণের হিকমত ও তাৎপর্য

(আক্রমণাত্মক জিহাদ কিভাবে ইসলামের প্রচার-প্রসারে ভূমিকা রাখে এ সম্পর্কে গত পর্বে (লিংক কমেন্টে) আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এ পর্বে ইসলাম প্রচারে জিযয়ার ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।)

জিযয়ার বিধানের ব্যাপারে আলেমগণ একমত যে, জিযয়া গ্রহণের উদ্দেশ্য কাফেরদেরকে কুফরীতে বহাল রাখা নয়। বরং জিযয়ার উদ্দেশ্য হলো, কাফেরদের ইসলামী হুকুমতের অধীনে মুসলমানদের সাহচর্যে থাকার সুযোগ করে দেওয়া। যেন তারা ইসলামের সত্যতার দলিল-প্রমাণ এবং ইসলামী বিধিবিধানের সৌন্দর্যের ব্যাপারে অবহিত হতে পারে। এর পাশাপাশি তাদেরকে কিছুটা লাঞ্ছিত-অপদস্থও করতে হবে। যেন লাঞ্ছনা-অপদস্থতা থেকে বাঁচা এবং সত্য ধর্ম গ্রহণের যুগপৎ প্রেরণা তাদেরকে ইসলামগ্রহণে বাধ্য করে।

জিযয়ার হিকমত ও তাৎপর্য সম্পর্কে বিখ্যাত মুফাসসির ইমাম রাযী রহ. বলেন,

ليس المقصود من أخذ الجزية تقريره على الكفر، بل المقصود منها حقن دمه وإمهاله مدة، رجاء أنه ربما وقف في هذه المدة على محاسن الإسلام وقوة دلائله، فينتقل من الكفر إلى الإيمان.
لا بد معه من إلحاق الذل والصغار للكفر والسبب فيه أن طبع العاقل ينفر عن تحمل الذل والصغار، فإذا أمهل الكافر مدة وهو يشاهد عز الإسلام ويسمع دلائل صحته، ويشاهد الذل والصغار في الكفر، فالظاهر أنه يحمله ذلك على الانتقال إلى الإسلام، فهذا هو المقصود من شرع الجزية. (16/27 ط. دار إحياء التراث العربي)

"জিযয়া গ্রহণের উদ্দেশ্য কাফেরদের কুফরের উপর বহাল রাখা উদ্দেশ্য নয়। বরং জিযয়া নেওয়ার উদ্দেশ্য হলো তার জীবন রক্ষা করা এবং কিছু সময়ের জন্য তাকে অবকাশ দেওয়া, যেন সে এই সময়ে ইসলামের সৌন্দর্য ও মযবুত দলিল-প্রমাণের ব্যাপারে অবগতি লাভ করে ইসলাম গ্রহন করতে পারে। ....

জিযয়া নেওয়ার পাশাপাশি কুফরের কারণে কাফেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করতে হবে, কেননা বুদ্ধিমান মানুষ লাঞ্ছনা-অপমান সহ্য করতে পারে না। যখন কাফেরকে কিছুদিনের জন্য অবকাশ দেওয়া হবে এবং সে ইসলামের সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তি লক্ষ্য করবে, দলিল-প্রমাণ শুনবে এবং কুফরের মধ্যে লাঞ্ছনা ও যিল্লতি প্রত্যক্ষ করবে। তখন সে খুব সহজেই ইসলাম গ্রহণ করবে। এটাই জিযয়া গ্রহণের

উদ্দেশ্য। -তাফসীরে রাযী: ১৬/২৭

হাফেয ইবনে হাজার রহ. সহিহ বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থ ফাতহুল বারীতে বলেন,

قال العلماء: الحكمة في وضع الجزية أن الذل الذي يلحقهم يحملهم على الدخول في الإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من الاطلاع على محاسن الإسلام. (فتح الباري: 6 : 259 ط. دار الفكر)

"আলেমগণ বলেন, জিযয়া গ্রহণের হিকমত হলো তাদেরকে এর মাধ্যমে লাঞ্ছিত-অপদস্থ করা, যেন তা তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে, পাশাপাশি তারা মুসলমানদের সংস্পর্শে থেকে ইসলামের সৌন্দর্যের ব্যাপারে অবগতি লাভ করবে।" -ফাতহুল বারী, ৬/২৫৯ - আরো উদ্ধৃতির জন্য দেখুন, মাবসুতে সারাখসী, ১০/৭৭ দারুল মারেফা, বৈরুত, ১৪১৪ হি. বাদায়েউস সানায়ে, ৭/১১১ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তৃতীয় প্রকাশনা, ১৪০৬ হি. রদ্দুল মুহতার, আল্লামা শামী, ৪/২০০ দারুল ফিকর, দ্বিতীয় প্রকাশনা, ১৪১২ হি. আললুবাব ফি ইলমিল কিতাব, ইবনে আদেল হাম্বলী, ১০/৬৮ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, প্রথম প্রকাশনা, ১৪১৯ হি. মওসুয়্যাহ ফিকহিয়্যাহ, ১৫/১৫৮

কুরআন কাফেরদের লাঞ্ছিত-অপমানিত করে তাদের থেকে জিযয়া গ্রহণের আদেশ দিয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

"কিতাবীদের মধ্যে যারা আল্লাহর প্রতি ইমান রাখে না এবং পরকালেও নয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা কিছু হারাম করেছেন তাকে হারাম মনে করে না এবং সত্য দ্বীনকে নিজের দ্বীন বলে স্বীকার করে না, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো, যতক্ষণ না তারা হেয় হয়ে নিজ হাতে জিযয়া প্রদান করে।" -সুরা তাওবা, ২৯

এ লাঞ্ছনার পদ্ধতি কেমন হবে? কিভাবে যিম্মী কাফেরদের অপমানিত করা হবে?- এর বিস্তারিত বিবরণ হাদিস ও আছারে সাহাবার আলোকে ফুকাহায়ে কেরাম লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার কারণে এ সম্পর্কে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করছি না। 'অমুসলিমদের সাথে মুসলিমদের আচরণবিধি' শিরোনামে যিম্মীদের লাঞ্ছিত করার বিস্তারিত পদ্ধতি নিয়ে ইনশাআল্লাহ আমরা আলাদা প্রবন্ধ লিখবো। এখানে উদাহরণস্বরুপ শুধু একটি হাদিস ও একটি আছার উল্লেখ করছি:

حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق، فاضطروه إلى أضيقه». (صحيح مسلم : 2167)

"ইহুদী ও নাসারাদের আগে সালাম দিও না। আর তাদের কাউকে পথে দেখলে তাকে পথের সংকীর্ণতম অংশে চলতে বাধ্য করো।" -সহিহ মুসলিম, ২১৬৭ (ইফা, ৫/১৮৪)

শামের খৃষ্টানদের সাথে সন্ধির সময় উমর রাযি. এর শর্তাবলী, যা ইতিহাসে 'শুরুতে উমারিয়্যাহ' নামে প্রসিদ্ধ-

عن عبد الرحمن بن غنم، قال: «كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح أهل الشام: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا، إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا، وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما خرب منها، ولا نحيي ما كان منها في خطط المسلمين، وأن لا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل، وأن ننزل من مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام ونطعمهم، وأن لا نؤمن في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسا، ولا نكتم غشا للمسلمين، ولا نعلم أولادنا القرآن، ولا نظهر شركا ولا ندعو إليه أحدا، ولا نمنع أحدا من قرابتنا الدخول في الإسلام إن أراده، وأن نوقر المسلمين، وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا جلوسا، ولا

نتشبه بهم في شيء من لباسهم من قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نتكنى بكناهم، ولا نركب السروج، ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئا من السلاح، ولا نحمله معنا، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور، وأن نجز مقاديم رءوسنا، وأن نلزم زينا حيث ما كنا، وأن نشد الزنانير على أوساطنا، وأن لا نظهر صلبنا وكتبنا في شيء من طريق المسلمين ولا أسواقهم، وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا، وأن لا نضرب بناقوس في كنائسنا بين حضرة المسلمين، وأن لا نخرج سعانينا ولا باعونا، ولا نرفع أصواتنا مع أمواتنا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طريق المسلمين، ولا نجاوزهم موتانا، ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين، وأن نرشد المسلمين، ولا نطلع عليهم في منازلهم.

فلما أتيت عمر رضي الله عنه بالكتاب زاد فيه: وأن لا نضرب أحدا من المسلمين ، شرطنا لهم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا منهم الأمان، فإن نحن خالفنا شيئا مما شرطناه لكم فضمناه على أنفسنا فلا ذمة لنا، وقد حل لكم ما يحل لكم من أهل المعاندة والشقاوة». راجع: معجم ابن المقرى (365) السنن الكبرى للبيهقي، (18717) أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل للخَلَّال (1000) وتفسير ابن كثير:

“এ হচ্ছে শাম দেশের অমুক অমুক নগরের অধিবাসীগণের পক্ষ হতে আল্লাহর বান্দা আমীরুল-মুমিনীন উমরকে প্রদত্ত লিখিত প্রতিজ্ঞাসমূহ- “আপনারা যখন আমাদের নিকট আগমন করিলেন, তখন আমরা নিজেদের জন্য, আমাদের সন্তান-সন্ততির জন্য, আমাদের ধন-সম্পত্তির জন্য এবং

আমাদের ধর্মাবলম্বী লোকদের জন্য আপনাদের নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করলাম। উক্ত নিরাপত্তার বিনিময়ে আমরা প্রতিজ্ঞা করছি যে: আমরা আমাদের নগরে বা তার চারপাশে কোথাও কোন নতুন গীর্জা ও ইবাদতখানা নির্মান করবো না; কোন পুরাতন গির্জা মেরামত করবো না; ইতিপূর্বে যে গীর্জা ও ইবাদতখানা মুসলমানদের নিজস্ব সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে সেগুলোকে পুনরায় গির্জা ও ইবাদতখানায় রূপান্তর করবো না; আমাদের কোন গির্জায় দিনে বা রাতে কোন মুসলমান অবস্থান করতে চাইলে তাকে বাঁধা দিবো না; আমাদের গির্জাগুলোর দ্বারসমূহ পথিক ও মুসাফিরদের জন্য উন্মুক্ত রাখবো; কোন পথিক মুসলমান আমাদের আবাসস্থলের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলে তিনদিন পর্যন্ত তার মেহমানদারী করবো; আমাদের গির্জায় বা বাসস্থানে কোন গুপ্তচরকে আশ্রয় দিবো না; মুসলমানদের সাথে কোনরূপ প্রতারণমূলক আচরণ করবো না; আমাদের সন্তানদের কুরআন শিখাবো না; প্রকাশ্যে কোন প্রকার শিরক করবো না, কাউকে শিরকের প্রতি আহ্বানও জানাবো না; আমাদের কোন আত্মীয় ইসলামগ্রহণ করতে চাইলে তাকে বাধা দিবো না; মুসলমানদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবো; কোন মুসলমান আমাদের মজলিসে বসতে চাইলে আমরা উঠে গিয়ে তার জন্য জায়গা করে দিবো; মুসলমানদের লেবাস-পোশাকের ন্যায় কোন লেবাস-পোশাক আমরা

পরিধান করবো না; টুপি পরবো না; পাগড়ী ব্যবহার করবো না; (দামী) জুতো পরবো না; মাথায় সিঁথি কাটবো না; মুসলমানদের ভাষার ন্যায় ভাষা ব্যবহার করবো না; মুসলমানদের উপনামের ন্যায় উপনাম গ্রহণ করবো না; অশ্বাদি ও বাহনে গদি ব্যবহার করবো না; গলায় তরবারি ঝুলিয়ে চলাফেরা করবো না; কোন প্রকারের অস্ত্র রাখবো না; কোন প্রকারের অস্ত্র বহন করবো না; আংটিতে আরবী ভাষায় কোন কিছু খোদাই করবো না; মদের বেচা-কেনা করবো না; মাথার সম্মুখভাগের চুল ছেটে ফেলবো; যেখানেই থাকি না কেন সর্বত্র ও সর্বদা টিকি রাখবো; দেহে পৈতাধারণ করবো; গির্জায় প্রকাশ্য স্থানে ক্রুশ রাখবো না; মুসলমানদের রাস্তায় বা তাদের বাজারে ক্রুশ বা নিজেদের ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশ করবো না; গির্জায় উচ্চ শব্দে ঘন্টা বাজাবো না; মুসলমানদের উপস্থিতিতে গির্জায় উচ্চস্বরে নিজেদের ধর্মীয় পুস্তক পাঠ করবো না; ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে কোনরূপ মিছিল বের করবো না; মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যাওয়ার সময় উচ্চস্বরে ক্রন্দন করবো না; মুসলমানদের রাস্তা বা বাজারের মধ্য দিয়ে মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যাবো না; কোন মুসলমান কর্তৃক ব্যবহৃত দাসকে ব্যবহার করবো না; পথিক মুসলমানদের প্রয়োজনে তাকে পথ দেখিয়ে দিবো এবং কোন মুসলমানের ঘরে উঁকি মারবো না।

আবদুর রহমান বিন গানাম আশআরী রহ. বলেন, উপরোক্ত চুক্তিপত্র নিয়ে আমি উমর রা. এর নিকট পৌঁছলে তিনি তাতে নিম্নোক্ত শর্তগুলো সংযোজিত করেন: আমরা কোন মুসলমানকে প্রহার করবোন না। উক্ত শর্তসমূহকে মেনে নিয়ে আমরা নিরাপত্তা লাভ করলাম। আমরা উক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত ভঙ্গ করলে আমাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আপনাদের (মুসলমানদের) উপর কোন দায়িত্ব থাকবে না। এমতাবস্থায় আমাদের সাথে শত্রুর ন্যায় আচরণ করা আপনাদের জন্য বৈধ হয়ে যাবে।” –সুনানে বাইহাকী, হাদিস: ১৮৭১৭ তাফসীরে ইবনে কাসীর, ইফা, ৪/৫৬৬

বর্তমানে প্রায় সব আলেমের মুখেই শুনা যায়, ইসলাম যিম্মীদের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা দেয়, তাদেরকে মুসলিমদের সমান অধিকার দেয়। তারা বলেন, অমুসলিম থেকে জিযয়া নেয়া হয়, শুধু মাত্র রাষ্ট্রীয় ট্যাক্স হিসেবে, ইসলামী হুকুমত কর্তৃক যিম্মীদের নিরাপত্তা বিধানের বিনিময় হিসেবে, যেমনিভাবে মুসলমানদের থেকেও যাকাত নেয়া হয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, তাহলে কুরআনে তাদেরকে লাঞ্ছিত করার আদেশ কেন দেয়া হয়েছে, হাদিসে তাদেরকে পথের সংকীর্ণতম অংশে ঠেলে দেয়ার আদেশ কেন দেয়া হয়েছে,

উমর রাযিআল্লাহু আনহুই বা কেন তাদের উপর নানারকম লাঞ্ছনাজনক শর্ত আরোপ করেছিলেন? কোথায় উমর রাযি. এর শর্তাবলী আর কোথায় তাদের দাবীকৃত 'অমুসলিমদেরকে মুসলিমদের সমঅধিকার প্রদান'।

তাদের কথাবার্তায় বারবার প্রতিধ্বনিত হয়, "শুধু কুফরের কারণে কাউকে হত্যা করা, বা তার মানহানি করা বৈধ নয়।" যেন কুফর কোন অপরাধই নয়? কাফের জীবনভর কুফরের উপর বহাল থাকলেও কোন সমস্যা নেই! তবে কি কুফরের কারণে আল্লাহ তায়ালা পূর্ববর্তী উম্মতসমূহকে যে শাস্তি প্রদান করেছেন তাও ঠিক হয়নি! নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক! কোন বোকা বলতে পারে, আল্লাহ তায়ালা কুফরের কারণে তাদের শাস্তি দেননি, বরং সমকামিতা ইত্যাদি অপরাধের কারণে তাদের শাস্তি দিয়েছেন। তাহলে কি সমকামিতা ও মাপে কম দেয়া কুফরের চেয়েও বড় অপরাধ? এ অপরাধগুলোর কারণে শাস্তি দেয়া বৈধ হলে, ধর্ষণের কারণে হত্যা করা বৈধ হলে, কেন কুফরের কারণে শাস্তি দেয়া বৈধ হবে না? অথচ কুফর হলো খোদাদ্রোহীতা যা সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ। আল্লাহ তায়ালা বলছেন, তাঁর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীব হলো কাফেররা। -সুরা আনফাল, ৫৫।

আসলে এখন সবকিছুই উল্টে যাচ্ছে, অতীতে জমিয়্যতে উলামায়ে হিন্দ, “হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই” শ্লোগান দিয়েছে। আজ তাদের উত্তরসূরী আরশাদ মাদানী আরেক ধাপ আগে বেড়ে বলছেন, “হিন্দুরা আমাদের বড় ভাই, আমরা তাদের ছোট ভাই!” আগামীকাল হয়তো দেখবো, মুসলমানরা দাওয়াতের স্বার্থে (?) কাফেরদের জুতো সোজা করে দিচ্ছে! এভাবেই আমাদের ইসলামের পরিবর্তে এক নতুন ধর্মে দীক্ষিত করা হচ্ছে। আর আমরা ইহুদীদের মত দরবারী-মন্দ আলেমদের অন্ধ অনুসরণ করে জাহান্নামের পথে ছুটে চলেছি। আর এভাবেই আমাদের উপর রাসূলের ভবিষ্যৎবানী প্রতিফলিত হচ্ছে- “তোমরা পূর্ববর্তীদের আচার-আচরণকে পূর্ণরূপে অনুকরণ করবে। এমনকি তারা যদি গুঁইসাপের গর্তেও প্রবেশ করে থাকে, তাহলে তোমরাও এতে তাদের অনুকরণ করবে। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরা কি ইহুদী ও নাসারা? তিনি বললেন, তবে আর কারা?” –সহিহ বুখারী, ৭৩২০ (ইফা, ১০/৫০৭) সহিহ মুসলিম, ২৬৬৯

৮.ইসলাম প্রচারে তরবারীর ভূমিকা (চতুর্থ পর্ব:- দাসপ্রথা বহাল রাখার হিকমত ও তাৎপর্য)

যুদ্ধবন্দীদের গোলাম-বাঁদী বানানোর হিকমত

(গত পর্বগুলোতে আমরা ইসলাম প্রচারে আক্রমণাত্মক জিহাদ ও জিযয়ার হিকমত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। (লিংক কমেন্টে) এ পর্বে ইসলাম প্রচারে গোলাম-বাঁদী বানানোর হিকমত নিয়ে আলোচনা করবো। তবে বিষয়টি জটিল হওয়ায় প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়ে গেছে। তাই দুই পর্বে ভাগ করে প্রবন্ধটি পেশ করবো ইনশাআল্লাহ)

এ মাসয়ালায় এসে বহু রথী-মহারথীদেরও পা পিছলে গেছে। এমনকি গত শতাব্দী থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত শুধু হাতেগোণা দুই একজনই পাওয়া যায় যারা এ ব্যাপারে স্বচ্ছ ধারণা রাখে। অন্যথায় অধিকাংশই এ বিধানের ব্যাপারে বিভিন্ন ওজরখাহী করতে থাকে, মনগড়া নানা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে থাকে, যেমন তারা বলে, "ইসলাম ঐ যমানার পারিপার্শ্বিক কারণে যুদ্ধবন্দীদের গোলাম বানানোর আদেশ দিয়েছে। যেহেতু কাফেররাও তখন বন্দীদের গোলাম বানাতো তাই মুসলমানদের জন্য গোলাম বানানো ব্যতীত কোন উপায় ছিল না" ইত্যাদি। মূলত এসব হলো পাশ্চাত্যদের নিকট নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি বন্ধক রেখে দেওয়ার ফলাফল। তাই বর্তমান আকাবিররাও ওদের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেই ভালো-মন্দ নির্ণয় করে থাকেন। কাফেরদের দৃষ্টিতে মানুষকে গোলাম বানানো মন্দ তাই

তাদের নিকটও তা মন্দ।

অথচ রাসুলের হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি, কাফেরদের গোলাম বানানো অত্যন্ত প্রশংসনীয় বিষয়, কেননা এর মাধ্যমে তারা মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে তাদের উত্তম জীবনাচার প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাবে এবং এর প্রভাবে তারা ধীরে ধীরে মুসলমান হয়ে যাবে। আবু হুরাইরা রাযি. এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل» صحيح «
البخاري: (3010)

“আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তিদের দেখে অবাক হন যাদেরকে শিকলাবদ্ধ করে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়।” -সহিহ বুখারী: ৩০১০

হাদিসের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেন,

قال ابن الجوزي: (معناه أنهم أسروا وقيدوا، فلما عرفوا صحة الإسلام دخلوا طوعا فدخلوا الجنة، فكان الإكراه على الأسر والتقييد هو السبب الأول، ولما كان هو السبب في دخول الجنة أقام المسبب مقام السبب) .... (فتح الباري: 6/145

“ইবনুল জাওযী রহ. বলেন, হাদিসের অর্থ হলো তাদেরকে বন্দী করে নিয়ে আসা হবে, যখন তারা ইসলামের সত্যতা বুঝতে পারবে তখন স্বেচ্ছায় ইসলামে প্রবেশ করবে। সুতরাং বন্দী করাটা হবে ইসলাম গ্রহণের কারণ আর ইসলাম গ্রহণ হবে জান্নাতে প্রবেশের কারণ। তাই বন্দী করে নিয়ে আসাকেই জান্নাতে প্রবেশের কারণ বলা হয়েছে।” -ফাতহুল বারী: ৬/১৪৫

এরপর হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেন,

ونحوه ما أخرجه من طريق أبي الطفيل رفعه: رأيت ناسا من أمتي يساقون إلى الجنة في السلاسل كرها. قلت: يا رسول الله من هم؟ قال قوم من العجم يسبيهم المهاجرون فيدخلونهم في الإسلام مكرهين. (فتح الباري: 6/145)

“উল্লেখিত হাদিসটির মত আরেকটি হাদিস হলো যা (ইমাম বাযযার) আবুত তুফাইল রাযি. এর সূত্রে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, ‘আমি আমার উম্মতের কিছু ব্যক্তিকে জোরপূর্বক জান্নাতের দিকে নিয়ে যেতে দেখেছি। আবুত তুফাইল বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, তারা কারা? তিনি বললেন, তারা হলো কিছু অনারবী লোক, যাদেরকে মুহাজিররা বন্দী

করে নিয়ে আসবে, ফলে তারা বাধ্য হয়ে ইসলাম গ্রহণ করবে।" -ফাতহুল বারী: ৬/১৪৫

অর্থাৎ তাদেরকে নিজেদের অবস্থায় ছেড়ে দিলে তারা কখনোই ইসলাম গ্রহণ করতো না। কিন্তু যখন তাদেরকে জোরপূর্বক বন্দী করে নিয়ে আসা হলো, এবং তারা কুরআনের আয়াত ও রাসূলের হাদিস শুনলো এবং মুসলমানদের জীবনাচার দেখলো তখন স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করলো।

ইমাম ইবনে হিব্বান রহ. (মৃ: ৩৫৪ হি.) বলেন,

والقصد في هذا الخبر: السبي الذي يسبيهم المسلمون من دار الشرك، مكتفين في السلاسل يقادون بها إلى دور الإسلام، حتى يسلموا فيدخلوا الجنة، ولهذا المعنى أراد صلى الله عليه وسلم بقوله في خبر الأسود بن سريع: أو ليس خياركم أولاد المشركين، وهذه اللفظة أطلقت أيضا بحذف (من) عنها يريد: "أو ليس من خياركم". (صحيح ابن حبان، 1 : 344 ط مؤسسة الرسالة، 1408 هـ)

"এ হাদিসের উদ্দেশ্য হলো যুদ্ধবন্দীদের মুসলামনরা কাফের রাষ্ট্র থেকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে ইসলামী রাষ্ট্রে নিয়ে আসবে। ফলে তারা ইসলাম গ্রহণ করে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ

অর্থেই অন্য হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, ‘তোমাদের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছে মুশরিকদের সন্তানরা’ (যাদেরকে তোমরা বন্দী করে নিয়ে এসে মুসলমান বানাও)।” -সহিহ ইবনে হিব্বান, ১/৩৪৪

عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: «خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم، حتى يدخلوا في الإسلام». صحيح البخاري: 4557

“আবু হাযেম রহ বলেন, ‘তোমরা সর্বোত্তম জাতি যাদের উত্থান হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য’ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, ‘তোমরা মানবজাতির জন্য সবচেয়ে কল্যাণকর, তোমরা তাদেরকে শিকলাবদ্ধ করে নিয়ে আসবে, ফলে তারা ইসলামে প্রবেশ করবে’।” -সহিহ বুখারী: ৪৫৫৭

হাদিসের ব্যাখায় হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেন,

أي أنفعهم لهم وإنما كان ذلك لكونهم كانوا سببا في إسلامهم

অর্থাৎ তোমরা মানব জাতির জন্য সবচেয়ে উপকারী ও কল্যাণজনক, কেননা তোমরা তাদের ইসলাম গ্রহণের কারণ হবে। -ফাতহুল বারী: ৮/২২৫

কাফেরদের গোলাম বানানোর দ্বারা তারা কিভাবে দলে দলে মুসলমান হয়েছে- ইমাম নববীর নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে এর সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়, তিনি বলেন,

معظم عساكر الإسلام في بلاد الشام ومصر سبوا ثم هم اليوم بحمدالله يسبون الكفار وقد سبوهم في زماننا مرارا كثيرة يسبون في المرة الواحدة من الكفار ألوفا شرح النووي على مسلم (18/ 21)

"বর্তমানে শাম ও মিসরের সেনাবাহিনীর অধিকাংশই হলো যুদ্ধবন্দী গোলাম, তারা যুদ্ধবন্দী হয়ে ইসলামগ্রহণ করেছে, এরপর আলহামদুলিল্লাহ তারাই এখন হাজার-হাজার কাফেরকে বন্দী করছে। -শরহু মুসলিম, ১৮/২১

ইমাম ইবনে কুদামা মাকদিসী রহ. (মৃ: ৬২০ হি.) বলেন,

ومنع أحمد من فداء النساء بالمال؛ لأن في بقائهن تعريضا لهن للإسلام، لبقائهن عند المسلمين وجوز أن يفادى بهن أسارى المسلمين؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فادى بالمرأة التي أخذها من سلمة بن الأكوع، ولأن في ذلك استنقاذ مسلم متحقق إسلامه، فاحتمل تفويت غرضية الإسلام من أجله. ولا يلزم من ذلك احتمال فواتها، لتحصيل المال. فأما الصبيان، فقال أحمد: لا يفادى بهم؛ وذلك لأن الصبي يصير مسلما بإسلام سابيه، فلا يجوز رده إلى المشركين. (المغني: 9/224 ط. مكتبة القاهرة 1388هـ)

“ইমাম আহমদ রহ. নারী যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দিতে নিষেধ করেছেন। কেননা তারা মুসলমানদের সংস্পর্শে থাকলে তাদের ইসলাম গ্রহণের আশা থাকে। তবে তাদের মাধ্যমে বন্দী বিনিময় করা যেতে পারে। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালামা বিন আকওয়া রাযি. এর বাঁদীর মাধ্যমে বন্দী বিনিময় করেছেন। তাছাড়া নারীদের মুসলিম হওয়া সুনিশ্চিত নয়, পক্ষান্তরে তাদের বিনিময়ে যাদের মুক্ত করে আনা হবে তারা তো মুসলিম। কিন্তু বাচ্চাদের মাধ্যমে বন্দী বিনিময় করা যাবে না। কেননা বাচ্চারা মুসলিমদের দাস হওয়ার কারনে তারাও মুসলিম হয়ে যাবে, তাই তাদেরকে কাফেরদের নিকট ফেরত দেওয়া যাবে না।” -আলমুগনী, ৯/২২৪

এ থেকে আমরা দুটি বিষয় বুঝতে পারি,

১. নারীদের বন্দী করে দাসী বানালে তাদের মুসলিম হওয়ার আশা থাকে।

২. শিশুরা বন্দী করে আনার দ্বারাই মুসলিম হয়ে যাবে। এমনকি তারা পরবর্তীতে নিজেদের পূর্বের ধর্মে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করলেও তাদের সেই সুযোগ দেওয়া হবে না। বরং নাবালেগ হলে বন্দী-প্রহার ইত্যাদি শাস্তির মাধ্যমে

জোরপূর্বক ইসলামে ফিরে আসতে বাধ্য করা হবে। আর বালেগ হলে তাদের ক্ষেত্রেও মুরতাদের বিধান প্রযোজ্য হবে।

যারা দাবী করেন, ইসলাম স্বাধীনভাবে যে কোন ধর্ম পালনের অনুমতি দেয়, তাদের নিকট প্রশ্ন, এখানে এই শিশুদের স্বাধীনভাবে ধর্মপালনের সুযোগ দেওয়া হলো কোথায়?

মূলত শিশুরা ধর্মের ক্ষেত্রে তাদের লালনপালনকারীদের অনুসরণ করে, তাই যদি তারা মুসলমানদের ঘরে বেড়ে উঠে তখন স্বাভাবিকভাবেই তারা মনে-প্রাণে মুসলিম হিসেবেই বেড়ে উঠবে। যেমনটা আমরা রাসুলের প্রসিদ্ধ হাদিস থেকে জানতে পারি, “প্রতিটি শিশুই স্বভাবধর্ম ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু তারা পিতা-মাতা তাকে ইহুদী-খৃষ্টান বা অগ্নিপূজারী বানায়। -সহিহ বুখারী, ১৩৫৮ সহিহ মুসলিম, ২৬৫৮ তাই শিশুদের ধর্মগ্রহণে কোন ইখতিয়ার দেওয়া হয়নি।

পক্ষান্তরে প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষদের যদি জোরপূর্বক মুসলমান বানানো হয় তাহলে তারা মুখে কালেমা পড়লেও অন্তর হতে ইসলাম গ্রহণ করবে না, তাই তাদেরকে

জোরপূর্বক মুসলমান বানাতে বলা হয়নি। বরং বিভিন্ন কৌশলে চাপ প্রয়োগ করে মুসলমান হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

৯.ইসলাম প্রচারে তরবারীর ভূমিকা (পঞ্চম পর্ব)

যেহেতু ইসলামে দাসপ্রথা বহাল রাখার প্রধান কারণ হলো- তাদেরকে মুসলমানদের সংস্পর্শে রেখে ইসলামগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা, এজন্যই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাসদের সাথে সদাচারের প্রতি খুব বেশী উৎসাহিত করেছেন, এ বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করেছেন। মনিব নিজে যে মানের খাবার খায় গোলামকেও সেই মানের খাবার খাওয়াতে বলেছেন। মনিব নিজে যে ধরণের পোশাক পরে তাকেও সেই ধরণের পোশাক সরবরাহ করার আদেশ দিয়েছেন। -সহিহ বুখারী, ৩০ সহিহ মুসলিম, ১৬৬১। এমনকি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায়ও বারংবার একথা বলছিলেন, الصلاة وما ملكت أيمانكم "তোমরা নামাযের প্রতি যত্নবান হও এবং দাসদাসীদের সাথে ভালো ব্যবহার করো।" -সুনানে ইবনে মাজাহ, ১৬২৫

বলাবাহুল্য, মুসলমfনদের সংস্পর্শে থেকে যখন বন্দী দাস-দাসীরা তাদের উত্তম জীবনাচার প্রত্যক্ষ করবে, বিশেষকরে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে দেখবে, পাশাপাশি মুসলমানদের অধীনে থাকার দরুন ইসলাম গ্রহণে অন্য কোন বাধাও থাকবে না, তখন তারা সহজেই ইসলাম গ্রহণ করবে।

ইসলামের স্বর্ণযুগে আমরা এমনটাই দেখতে পাই। সাহাবা-তাবেয়ীগণ যে কাফেরদের বন্দী করে এনেছেন তারা প্রায় সকলেই মুসলমfন হয়ে গিয়েছিলেন। বরং তাঁরা নিজেরা কিংবা তাদের সন্তানরা বড় বড় আলেম-সেনাপতি-আমির হয়ে ইসলামের ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছেন। যদি এদেরকে গোলাম-বাঁদী না বানানো হতো তাহলে হয়তো তারা সারাজীবন কাফেরই থেকে যেতো।

এখন ভাবার বিষয় হলো দুটোর মধ্য কোনটা উত্তম:-
১:- ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াতে কিছুদিনের জন্য গোলাম হওয়ার লাঞ্ছনা ও যিল্লতি সহ্য করা। বিনিময়ে মুমিন হয়ে চিরস্থায়ী আখেরাতের সফলতা লাভ।
২:- দুনিয়াতে গোলাম হওয়ার লাঞ্ছনা ও যিল্লতি হতে বেঁচে থাকা, বিনিময়ে আখেরাতে চিরস্থায়ী জাহান্নামে প্রবেশ করা।

যে ব্যক্তি নিজের বিবেক-বুদ্ধি কাফেরদের নিকট গচ্ছিত রাখেনি তার বুঝতে বাকী থাকার কথা নয় যে, প্রথমটির সাথে দ্বিতীয়টার কোন তুলনাই চলে না। শায়েখ আনোয়ার আওলাকীর ভাষায়, “যদি আমার পূর্বপুরুষকে খালেদ বিন ওয়ালিদ রাযি. গোলাম বানিয়ে তার দ্বারা নিজের জুতোও পরিষ্কার করিয়ে থাকেন, তবুও তাতে আমি খুশি, কেননা এটা তার জন্য কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে জাহান্নামে যাওয়ার চেয়ে ভালো।”

তবে যেহেতু দাস-দাসী বানানো হলো ইসলাম গ্রহণের মাধ্যম, তাই ইসলাম চায় না, দাস-দাসীরা চিরকাল দাস হিসেবেই জীবনযাপন করুক, এজন্য ইসলামে দাস মুক্তির (বিশেষ করে মুসলিম দাস মুক্তির) বহু ফযীলত ও বিধান রয়েছে। হাদিসে এসেছে, “যে ব্যক্তি কোন মুমিন দাসকে আযাদ করবে তো দাসের শরীরের প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে তার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ জাহান্নাম হতে মুক্তি পাবে।”-সহিহ বুখারী ২৫১৭ সহিহ মুসলিম, ১৫০৯ সহিহ বুখারীর বর্ণনায় এসেছে, “এ হাদিস শুনে আলী বিন হুসাইন রহ. দশহাজার দিরহামের বিনিময়ে খরিদকৃত একটি দাসকে আযাদ করে দেন।” -সহিহ বুখারী, ২৫১৭

যে ব্যক্তিকে দাসীকে উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার পরে

আযাদ করে বিয়ে করে তাকে দ্বিগুণ সওয়াবের ওয়াদা প্রদান করা হয়েছে। -সহিহ বুখারী, ৯৭ সহিহ মুসলিম, ১৫৪

দাসী যদি মনিবের ঔরসে সন্তান জন্মদান করে তবে সে মনিবের মৃত্যুর পরে আযাদ হয়ে যায়। -সুনানে ইবনে মাজাহ, ২৫১৬ মুসনাদে আহমদ, ২৭৫৯

দাসদাসীরা যদি মুকাতাবাত তথা বিনিময় প্রদানের শর্তে আযাদ হওয়ার চুক্তি করতে চায় তবে মনিবদেরকে এ চুক্তি মঞ্জুর করার আদেশ করা হয়েছে। পাশাপাশি মনিব ও অন্যান্য মুসলমানদের এই চুক্তির বিনিময় আদায়ের ক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা করতে বলা হয়েছে। বরং এটাকে যাকাতের একটি মাসরাফ-খাত হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। -সুরা নুর, ২৪ সুরা তাওবা ৬০

তেমনিভাবে বিভিন্ন অপরাধের শাস্তিস্বরূপ দাস আযাদ করার আদেশ করা হয়েছে। যেমন:-

ক. কেউ যদি কোন মুসলমানকে ভুলে হত্যা করে ফেলে তাহলে তার অপরাধের কাফফারা হলো একটি মুসলিম দাস আযাদ করা, দাস আযাদ করার সামর্থ্য না থাকলে দুইমাস লাগাতার রোযা রাখা। -সুরা নিসা, ৯২

খ. কেউ স্ত্রীর সাথে যিহার করলে অর্থাৎ স্ত্রীকে মায়ের সাথে তুলনা করলেও তার কাফফারা হলো সামর্থ্য থাকলে দাস আযাদ করা। -সুরা মুজাদালা, ৩

গ. কেউ যদি রমযান মাসে ইচ্ছাকৃত রোযা ভেঙ্গে ফেলে তবে তার কাফফারাও হলো সামর্থ্য থাকলে দাস আযাদ করা। - সহিহ বুখারী, ১৯৩৬ সহিহ মুসলিম, ১১১১

হাদিসে এসেছে, "কেউ যদি দাসকে থাপ্পড় মারে কিংবা প্রহার করে তো এর কাফফারা হলো তাকে আযাদ করে দেওয়া।" -সহিহ মুসলিম, ১৬৫৭

উল্লিখিত হাদিসসমূহের কারণে সাহাবায়ে কেরাম ব্যাপক পরিমাণে দাস আযাদ করতেন, বিশেষকরে দাসদের ইসলাম গ্রহণের পর। মুয়াজ রাযি. একবার কিছু ক্রীতদাস হাদিয়া পান। তিনি নামায পড়তে দাঁড়ালে তারা পিছনে ইক্তেদা করতে আসে। তিনি তাদেরকে প্রশ্ন করেন, তোমরা কার জন্য নামায পড়ো? তারা বলে, আল্লাহর জন্য। এ কথা শুনে মুয়াজ বললেন, তবে যাও তোমরাও আল্লাহর জন্য (আযাদ)। -মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, ২২৩৯৩

প্রসিদ্ধ সাহাবী হাতেব বিন আবী বালতাআ রাযি. মৃত্যুর সময় তার দাস-দাসীদের মধ্যে যারা নামায পড়ে, রোযা রাখে তাদের আযাদ করে দেয়ার ওসিয়্যত করে যান। -মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, ১৩৬৪৪ ও ১৩৬৪৫

সারকথা হলো, দাসপ্রথার মাধ্যমে ইসলাম কাফেরদের মুসলমান বানানোর জন্য একটি পরিপূর্ণ নেযাম বা সিস্টেম তৈরি করেছে, যার সূচনা হবে তাদেরকে যুদ্ধবন্দী করে দাস বানানোর মাধ্যমে, আর সমাপ্তি হবে তাদেরকে আযাদ করা -বিশেষকরে ইসলাম গ্রহণ করার পরে- আযাদ করার মাধ্যমে। আর মাঝখানে তাদের সাথে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সদাচার করা হবে ইসলামের প্রতি তাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্যে। উল্লিখিত হাদিসগুলোর সমষ্টি থেকে আমরা এটাই বুঝতে পারি। এক্ষেত্রে ভুল ধারণা তৈরির কারণ হলো, অনেকেই শুধু দাস-দাসীদের সাথে ভালো ব্যবহার কিংবা তাদেরকে আযাদ করার প্রতি উৎসাহিত করার হাদিসগুলো লক্ষ্য করে, কিন্তু কাফেরদের দাস-দাসী বানানোর প্রতিও যে একাধিক হাদিসে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে তা জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে এড়িয়ে যায়, আর এভাবেই এ ব্যাপারে তাদের একটা খণ্ডিত ধারণা তৈরি হয়। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন।

এখানে একটা প্রশ্ন হতে পারে, যদি কাফেরদের মুসলিম বানানোই ইসলামের দাসপ্রথা বহাল রাখার প্রধান কারণ হয় তবে ইসলাম গ্রহণকেই কেন তাদের মুক্তির কারণ হিসেবে নির্ধারণ করা হলো না? কেন ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথেই তারা আযাদ হয়ে যাবে না?

এ প্রশ্নের একাধিক উত্তর হতে পারে, আমার মতে এর সবচেয়ে সুন্দর উত্তর হলো, যদি ইসলাম গ্রহণকেই দাসমুক্তির কারণ হিসেবে নির্ধারণ করা হতো, তাহলে সেটা অনেকটা ঘাড়ে তলোয়ার ধরে জোরপূর্বক মুসলমান বানানোর মতোই হতো। কেননা দাসত্ব এতই ঘৃণিত বিষয় যে, কোন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে দাসত্বের জীবনকে মেনে নিতে পারে না। তাই যদি ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথেই দাসরা আযাদ হয়ে যেতো, তবে ইসলাম সম্পর্কে অবগতির পূর্বেই দাসেরা শুধু মুক্তির জন্য ইসলাম গ্রহণ করতো। এরপর হয়তো তারা পালিয়ে কাফেরদের কাছে চলে যেতো কিংবা মুনাফিক হয়ে মুসলিম সমাজে বসবাস করে আমাদের ক্ষতিসাধন করতো। ফলে দাসপ্রথা বহাল রাখার অন্যতম উদ্দেশ্য, অর্থাৎ কিছুদিন দাস হিসেবে মুসলমানদের সংস্পর্শে থেকে ইসলামের সৌন্দর্যের ব্যাপারে অবগতি লাভের পাশাপাশি তাদের সাথে মুসলিমদের উত্তম

আচরণ প্রত্যক্ষ করে আন্তরিকভাবে মুসলমান হওয়া- এ লক্ষ্য অধরাই রয়ে যেতো।

চলবে ইনশাআল্লাহ

ইসলাম প্রচারে তরবারীর ভূমিকা (প্রথম পর্ব- 'তলোয়ারে নয় উদারতায়' শীর্ষক শ্লোগানের উৎপত্তি; সংক্ষিপ্ত ইতিহাস)https://dawahilallah.com/showthread....%26%232488%3B)

ইসলাম প্রচারে তরবারীর ভূমিকা (দ্বিতীয় পর্ব- আক্রমণাত্মক জিহাদের হিকমত ও তাৎপর্য)
https://dawahilallah.com/showthread....%26%232479%3B)

ইসলাম প্রচারে তরবারীর ভূমিকা (তৃতীয় পর্ব, জিযয়ার বিধানের হিকমত ও তাৎপর্য)
https://dawahilallah.com/showthread....%26%232479%3B)

ইসলামপ্রচারে তরবারীর ভূমিকা (চতুর্থ পর্ব:- দাসপ্রথা বহাল রাখার হিকমত ও তাৎপর্য)
https://dawahilallah.com/showthread....%26%232479%3B)

১০.ইসলাম প্রচারে তরবারীর ভূমিকা (শেষ পর্ব)

আমরা প্রবন্ধের একদম শেষদিকে চলে এসেছি। পূর্বোক্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ হলো, 'তরবারির জোরে ইসলাম প্রচারিত হয়নি' কথাটি আমাদের চূড়ান্ত দুশমন কাফেরদের একটি ষড়যন্ত্রমূলক বক্তব্য। একটি অর্থের বিচারে কথাটিকে সঠিক বলা গেলেও তারা সে উদ্দেশ্যে কথাটি বলেনি। তারা ঢালাওভাবে ইসলাম প্রচারে তরবারীর যে কোনো ভূমিকাকে অস্বীকার করেছে। তাদের এই শ্লোগান প্রচারের পর থেকে যেসব ফলাফল আমাদের সামনে এসেছে সেগুলো দেখলেই বিবেকবান সকলেই আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন। এই কথাটি প্রচারিত হবার পর তরবারীর মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের অন্যতম ফরয বিধান ইকদামী জিহাদকে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করা হয়েছে এবং ইকদামী জিহাদকে অস্বীকার করতে গিয়ে অস্বীকারকারীরা সাহাবায়ে কেরামকেও কালিমাযুক্ত করে ছেড়েছে। সাহাবাদের মত মহান চরিত্রের ব্যক্তিদের চরিত্রের উপর আঘাত হানতেও তারা কুণ্ঠিত হয়নি। প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার কারণে আমরা ইকদামী জিহাদ অস্বীকারকারীদের তালিকা দিচ্ছি না। দিলে পাঠক বুঝতে পারতেন এ জালে কত তা-বড় তা-বড় ব্যক্তিরাও ফেঁসে গেছেন। উপরোক্ত আলোচনার পর আমরা

দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করছি, ‘ইসলাম তরবারীর জোরে প্রচারিত হয়নি’ এটা ঢাহা মিথ্যা কথা। বরং ইসলাম প্রচারে তরবারীর গুরুত্ব অপরিসীম। জিহাদপ্রেমী এক আলেমকে এক শাগরেদ প্রশ্ন করে, ইসলাম কি তরবারীর জোরে প্রচারিত হয়েছে না আখলাকের মাধ্যমে? শাগরেদকে অবাক করে দিয়ে তিনি উত্তর দেন, “ইসলাম তো তরবারীওয়ালা আখলাকের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে।” আসলে এ কথাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই যে আজকে সব আলেম মিলে তরবারীকে আখলাকের বিপরীত মেরুতে দাড় করিয়ে দিচ্ছেন, তো আগামীকাল যখন কোন নাস্তিক-মুরতাদ কিতাবের পাল্টা উল্টে দেখিয়ে দিবে, রাসূল বলছেন, “আমি যোদ্ধা নবী;” “আমাকে তরবারী সহ প্রেরণ করা হয়েছে, যতক্ষণ না মানুষ এক আল্লাহর ইবাদত করে;” আমাকে মানুষের সাথে যুদ্ধের আদেশ করা হয়েছে যতক্ষণ না তারা ইমান আনে;” (সহিহ বুখারী, ২৫ সহিহ মুসলিম, ২০ শামায়েলে তিরমিযি, ৩০৩ মুসনাদে আহমদ ৫১১৪) তো এই হাদিসগুলোর জবাবে মুহতারাম আলেমগণ কি বলবেন? তখন কি এই তাঁরাই মানুষের বেইমান-মুরতাদ হওয়ার কারণ হবেন না?

পরিশেষে বলবো, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ইমান রাখে, তাকে হাকিম-আলিম মহাপ্রজ্ঞাবান-মহাজ্ঞানী বলে বিশ্বাস

করে তার জন্য আবশ্যক হলো, আল্লাহর বিধানের হিকমত বুঝে আসুক বা না আসুক, তা নিঃসঙ্কোচে মেনে নেওয়া। কুরআন মুমিনদের কাছে এ দাবীই করেছে,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. (سورة الأحزاب: 36)

"আল্লাহ ও তার রাসূল যখন কোন বিষয়ে ফায়সালা দান করেন, তখন কোন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর নিজেদের বিষয়ে কোন এখতিয়ার বাকি থাকে না।" -সূরা আহযাব, ৩৬

বরং এর বিপরীত করাকে কুফর গণ্য করেছে, ইরশাদ হয়েছে,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) سورة النساء : 65)

"না, (হে নবী) তোমার প্রভুর শপথ! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না নিজেদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের ক্ষেত্রে তোমাকে বিচারক মানে, তারপর তুমি যে রায় দাও, সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনোরূপ কুণ্ঠাবোধ না করে এবং অবনত মস্তকে তা গ্রহণ করে

নেয়।”- সুরা নিসা, ৬৫

সুতরাং যদি আমাদের ধ্যানধারণা এমনই হয় যে, আল্লাহ তায়ালার বিধান বুঝে এলে মানবো না হলে মানবো না, ভালো লাগলে মানবো অন্যথায় নয়, তাহলে আমরা মুমিন হতে পারবো না। আর বাস্তবতা হলো যদি আমরা দুনিয়াবী সব ব্যস্ততা থেকে অবসর হয়ে আমাদের পুরো জীবন আল্লাহ তায়ালার বিধানাবলীর হিকমত অনুধাবনে ব্যয় করি তবুও আমাদের সীমিত মেধা ও বুদ্ধি দিয়ে আল্লাহ তায়ালার সব বিধানের পূর্ণ হিকমত বুঝা সম্ভব না। এজন্যই যখন মক্কার কাফেররা সুদ হারাম হওয়ার বিধানের প্রতি আপত্তি করে বলেছিল, إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا (বিক্রিও তো সুদেরই মত হয়ে থাকে) তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের জবাবে ব্যবসার উপকারিতা এবং সুদের ক্ষতি ও ভয়াবহতা তুলে ধরেননি। বরং তাদের জবাবে শুধু এটাই বলেছেন,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম।” সূরা বাকারা, ২৭৫

ব্যাস, যদি আল্লাহর প্রতি ইমান থাকে, তবে তার আদেশ-নিষেধই যথেষ্ট। লাভ-ক্ষতি বিবেচনা ও হিকমত অনুধাবন

জরুরী নয়। আল্লামা তাকী উসমানী দা. বা. উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় এ বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, তিনি বলেন,

“প্রকৃত ব্যাপার হলো- আল্লাহ তায়ালার প্রতিটি হুকুমের ভেতর নিঃসন্দেহে কোনও না কোনও হিকমত নিহিত থাকে, কিন্তু সে হিকমত যে প্রত্যেকেরই বুঝে আসবে এটা অবধারিত নয়। কাজেই আল্লাহ তায়ালার প্রতি ইমান থাকলে প্রথমেই তার হুকুম শিরোধার্য করে নেওয়া উচিত। তারপর কেউ যদি অতিরিক্ত প্রশান্তি লাভের জন্য হিকমত ও রহস্য অনুধাবনের চেষ্টা করে তাতে কোন দোষ নেই। দোষ হচ্ছে সেই হিকমত উপলব্ধি করার উপর হুকুম পালনকে মুলতবী রাখা, যা কোনও মুমিনের কর্মপন্থা হতে পারে না।” - তাওযীহুল কুরআন, ১/১৬২

তাই আসুন শয়তানের সৃষ্ট সকল যুক্তি-তর্কের ঊর্ধ্বে উঠে এবং কাফেরদের তৈরি মানবতার তথাকথিত মূল্যবোধ ত্যাগ করে, অসীম প্রজ্ঞাবান মহান আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলামের বিধানাবলীর সামনে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করি, সাহাবায়ে কেরামের মহান আদর্শ سمعنا وأطعنا (আমরা আল্লাহর বিধান মনোযোগ সহকারে শুনেছি এবং খুশীমনে মেনে নিয়েছি -সুরা বাকারা, ২৮৫) এর বাস্তব অনুশীলন

করি। এরপর যদি তা পালন করতে পারি তবে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি। আর যদি মানবীয় দুর্বলতাবশত কোন বিধান পালন করতে নাই পারি তবে অনুতপ্ত হই। এতে আশা করা যায় আল্লাহ তায়ালা আমাদের ক্ষমা করবেন। কিন্তু বুঝে না আসা বা পালন করা কষ্টকর হওয়ার কারণে তাঁর বিধানের উপর আপত্তি তোলা, কুরআন-হাদিসের অপব্যাখ্যা করে আল্লাহ তায়ালার বিধানই পাল্টে দেওয়া, যারা এ বিধান পালন করছে তাদের বাতিল আখ্যা দেয়া, এতো সরাসরি আল্লাহ তায়ালার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল। আল্লাহ তায়ালা আমাদের এ থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দান করুন।

আমার সাধ্য অনুযায়ী আমি বিষয়টি স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি, তবে এর সাথে নিচের লিংক থেকে শায়েখ আনোয়ার আওলাকির ভিডিওটা দেখে নিলে এ বিষয়ে আরো স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করা যাবে ইনশাআল্লাহ।
https://www.youtube.com/watch?v=6JiG7cKv3Mc

ইসলাম প্রচারে তরবারীর ভূমিকা (প্রথম পর্ব- ‘তলোয়ারে নয় উদারতায়’ শীর্ষক শ্লোগানের উৎপত্তি; সংক্ষিপ্ত ইতিহাস)https://dawahilallah.com/showthread....%

26%232488%3B)

ইসলাম প্রচারে তরবারীর ভূমিকা (দ্বিতীয় পর্ব- আক্রমণাত্মক জিহাদের হিকমত ও তাৎপর্য)

https://dawahilallah.com/showthread....%26%232479%3B)

ইসলাম প্রচারে তরবারীর ভূমিকা (তৃতীয় পর্ব, জিযয়ার বিধানের হিকমত ও তাৎপর্য)

https://dawahilallah.com/showthread....%26%232479%3B)

ইসলামপ্রচারে তরবারীর ভূমিকা (চতুর্থ পর্ব:- দাসপ্রথা বহাল রাখার হিকমত ও তাৎপর্য)

https://dawahilallah.com/showthread....%26%232479%3B)

ইসলাম প্রচারে তরবারীর ভূমিকা:- (পঞ্চম পর্ব)

https://dawahilallah.com/showthread....%26%232476%3B)